# তৈন্‌গাঙ

সপ্তম সংখ্যা, ৯ আগস্ট ২০১৫

Toingang Literature Forum
Estd. 2005

তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরাম, ঢাকা

# তৈন্‌গাঙ

তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরামের সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনা

তৈনৃগাঙ

বিশ্ব আদিবাসী দিবস, সংকলন-২০১৫

**সম্পাদক**

পার্থ প্রতিম তঞ্চঙ্গ্যা পিয়াল

তৈনৃগাঙ লিটারেচার ফোরাম

**সম্পাদন সহযোগী**

শ্যামলিকা তঞ্চঙ্গ্যা

রুবেল তঞ্চঙ্গ্যা

জেসান তঞ্চঙ্গ্যা

সুমন তঞ্চঙ্গ্যা

কৌশিক তঞ্চঙ্গ্যা

অরুন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

অঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা

সাধন তঞ্চঙ্গ্যা

**সার্বিক তত্ত্বাবধানে**

জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা

আহ্বায়ক

তৈনৃগাঙ লিটারেচার ফোরাম

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**

অরুণকান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

প্রকাশকাল : ৯ই আগস্ট, ২০১৫

**যোগাযোগ**

৪০৮, আ ফ ম কামাল উদ্দিন হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাভার, ঢাকা-১৩৪২

E-mail: pial1995ju@gmail.com

**শুভেচ্ছা মূল্য**

১০০ টাকা (ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫০ টাকা)।

# সূচিপত্র

## আদিবাসী বিষয়ক প্রবন্ধ



## তঞ্চঙ্গ্যা জাতিতাত্ত্বিক প্রবন্ধ



## কবিতা



## তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় কবিতা, ছড়া ও গান

# সম্পাদকীয়

আদিবাসী, শান্তিচুক্তি, ভূমি অধিকার, মানবাধিকার লজ্ঘন, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি শব্দগুলোই দীর্ঘদিন ধরে শুনতে শুনতে আজ আমাদের কাছে অনেক আপন হয়ে উঠেছে। আমাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সব যেন মিশে আছে এই শব্দগুলোর মাঝে। এই শব্দগুলো হাসলে আমাদের মাঝে যেন আনন্দ ঝড়ে পড়ে। আর পরক্ষনেই এই শব্দগুলোর নিরব কান্না যেন প্রতীনিয়ত আমাদের প্রতিবাদী হতে শেখায়। আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখি, অবিচারের প্রতিবাদ করতে শিখি আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখি। আর এভাবেই প্রতিবাদ করতে করতেই এই প্রতিবাদ শব্দটিও আমাদের কাছে অনেক আপন হয়ে ওঠে।

আসলে আমরা যখন আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলি তখন তার প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত আপন হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। প্রতিটি শব্দই যেন তখন হয়ে ওঠে হৃদয় নিংড়ানো অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। আমরা চাই আমাদের মাতৃভাষার আরো কিছু শব্দ আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠুক। প্রথমেই আমরা যে শব্দটি রাখতে চাই তা হল-"স্বপ্ন"। এ.পি.জে আবদুল কালামের ভাষায় "আমি সেই স্বপ্নের কথা আমাকে ঘুমাতে দেয় না।" বন্ধুগণ আসুন আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জন্য স্বপ্ন দেখি। নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্ন দেখি। সেই স্বপ্ন আমাদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে।

আসুন বন্ধুরা আমরা বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার স্বপ্ন দেখি। যে চর্চা আমাদের সবার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ করবে। এই স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে যেমন আমাদেরকে স্বপ্ন শব্দটি আপন করে নিতে হবে। তেমনি করে আপন করে নিতে হবে আরেকটি শব্দ সেটি হল "পরিশ্রম"। আমরা যদি স্বপ্ন ও পরিশ্রম এই দুটো শব্দ আপন করে নিতে পারি। তাহলে অবশ্যই আমরা নিজেদের স্বপ্নের সকল বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব।

আসুন আমরা স্বপ্ন দেখি ও পরিশ্রম করি এবং নিজেকে উন্নয়ন করি এবং পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস ২০১৫ সফল হোক।

সম্পাদক
প্বার্থ প্রতিম তঞ্চঙ্গ্যা পিয়াল
তৈন্‌গাঙ লিটারেচার ফোরাম

# উত্তর বঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যা নিয়ে একটি নোট

**মাহমুদুল সুমন**

---

১. কয়েক বছর আগের কথা। উত্তর বঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যা নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় উপস্থিত হয়েছি রাজশাহীতে। আলোচনা শুনে মনে হচ্ছিলঃ নানা ধারার কথা; উত্তর বঙ্গের আদিবাসী হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর ভূমি হারানোর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার উপর, অর্থাৎ কী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষজন নিজ জমি থেকে উৎখাত হয়েছে সে নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। কেউ কেউ আবার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার সুরক্ষার জন্য যে আইন উপনিবেশিক সময়কাল থেকেই আছে, তার কার্যকারিতা নিয়ে কথা তুলছিলেন বা আইনটির বাস্তবায়নে নানা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরছিলেন; কেউ কেউ বলছিলেন উত্তর বঙ্গের আদিবাসী জনসমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় একটি ভূমি কমিশনের কথা। আবার ঐ একই আলোচনায় কেউ মতামত দিয়েছিলেন, যৌথ-ভূমি-ব্যবস্থা রক্ষার পক্ষে।

কর্মশালা চলাকালীন সময়েই আমার সাথে কথা হয়েছিল সরাসরি কয়েকজন ভুক্তভোগীর সঙ্গে, যারা ভূমিগ্রাসীদের হাতে জমি হারিয়েছেন বা নানা ধরনের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গেছেন। আমার মনে আছে, আলোচনার মূল স্বরটা এদের অনেকেই ধরতে পারছিলেন না। জমি-জমা নিয়ে নানাভাবে নিপীড়িত কিছু মানুষের হাতে সেদিন ছিল জমির দলিল সহ নানা কাগজ পত্র। হয়তো আশা করে এসেছিলেন ভূমিবিষয়ক এই ওয়ার্কশপ থেকে কোন সুরক্ষা বা উপকার পাবেন। কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি। আলোচনাটা হয়ে গিয়েছিল কিছুটা তাত্ত্বিক বা আদর্শিক ধরনের।

আজ অনেক বছর পর জাতীয় আদিবাসী পরিষদের অন্যতম সংগঠক রবীন্দ্রনাথ সরেন-এর কাছ থেকে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতি ও সেক্ষেত্রে সমাধানকল্পে কী করনীয় সে বিষয়ে কিছু পদক্ষেপের কথা শুনলাম। মনে হল, পূর্বের নানা পরিসরের আলোচনা থেকে সরে এসে ভূমি ও ভূমির অধিকার প্রশ্নে অনেক সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠছে আজকের পদক্ষেপ ও প্রস্তাবনাগুলো এবং সেটাই দরকার।

কতগুলো বিষয় এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছেঃ উত্তর বঙ্গের অনেক এলাকাতেই আদিবাসীদের জমি বিনা অনুমতিতে (ষ্টেইট একুইজেশ্যান এন্ড টেনেন্সি এক্ট এর ৯৭ ধারা অনুযায়ী এডিসি ল্যান্ড এর অনুমতি স্বাপেক্ষে আদিবাসী ব্যক্তির জমি হস্তান্তরের বাধ্যবাধকতা আছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই আইনকে এড়িয়ে জমির হস্তান্তর হয়ে থাকে) বিক্রি হয়েছে। এটি বিদ্যমান আইন পরিপন্থী। এক্ষেত্রে অনেকের মত, সরকার চাইলেই একটি অর্ডিন্যান্সের মধ্য দিয়ে এই সকল জমি-হস্তান্তর বাতিল করতে পারে। এছাড়া রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের অনেক জায়গায় বনবিভাগ সামাজিক বনায়নের নামে কিছু জমি দখল করেছে। এই জমিগুলোও ফেরত চেয়ে দাবী জানাবে জাপ । কেননা অদিবাসীদের নামে এই জমিগুলোর রেকর্ড আছে। আরো কিছু দাবীর মধ্যে আছে আদিবাসীরা যে সব খাস জমিতে অনেক বছর ধরে বসবাস করে আসছে, সেগুলো আদিবাসীদের মাঝেই বিতরণ করা। অনেকক্ষেত্রেই এগুলো অ-আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় বলে বিরোধ তৈরী হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

আমি মনে করি, এই উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন করা জরুরী। একথা ঠিক যে, ভূমি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সহ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে আদিবাসী সমাজে যে সংকট রয়েছে তা কমবেশী বাংলাদেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীরও সমস্যা। কিন্তু এই সাধারণ সিদ্ধান্ত টানার পরও আদিবাসী সমাজের নির্দিষ্ট সংকট গুলোকে ইতিহাস-ঘনিষ্ঠ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে সমাধানকল্পে কাজ করা খুবই জরুরী।

২. একটি সাক্ষাৎকারে আমরা অনেক ধরনের বক্তব্য পাই। কোন অংশে থাকে বক্তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। কোথাও প্রকাশ পায় তাঁর পর্যবেক্ষণ। কোথাও থাকে খুব আবেগের সাথে উঠে আসা কিছু কথামালা, আশঙ্কা। সাক্ষাৎকারে তাই কখনও কখনও আবেগের কথা থাকে, থাকতে পারে। থাকে আশাবাদের কথা, স্মৃতি। এই সবকিছুই বয়ান, ইংরেজিতে ন্যারেটিভ্।

সাধারণত বয়ান বলতে বোঝানো হয় এমন বক্তব্যসমষ্টি যার একটা গল্প চরিত্র আছে। তবে এর আরো নানা দিক আছে। একারনেই ন্যারেটিভ *জান্‌রা* প্রত্যয়টির প্রয়োগ দেখা যায় কোন কোন গবেষণায়। আত্মকে বুঝতে এই বয়ান জরুরী। 'আত্ম বর্ণনা' বলে সামাজিক গবেষণায় একটি ধারণা আছে। বয়ান রেকর্ড করা, তুলে ধরা বা সংরক্ষণ আত্ম প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ একটা উপায় হতে পারে। সমাজ গবেষণায় এটি একটি বহুল ব্যবহৃত হাতিয়ার (*টুল*)। এখানে আত্মপরিচয় নিয়ে আমার চলমান গবেষণা হতে একটি সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি। বক্তার পরিচয় এখানে গোপন করা হয়েছে।

১৯৬২ সালে রাজশাহীতে রায়ট হয়। তখন আদিবাসীরা আক্রান্ত হয়েছিল। '৬৫ সালে অনেক আদিবাসী সমাজের জমি অর্পিত করা হয়..আর এখন কাজ নাই। মজুরী বৈষম্য আছে। ...একসময় দেখা যাবে আদিবাসীরা আর এই দেশে থাকতে পারবেনা। আদিবাসীদের মধ্যে এখন আবারো দেশত্যাগী হবার সম্ভবনা আছে। আনেকেই হয়তো চলে যাবে ..হয়তো মিশে যাবে ঝারখন্ডে .. সেখানে বিশাল আদিবাসী এলাকা। বিশাল এলাকায় মিশে গেলে আর কিছু না হোক ..মনের প্রশান্তি পাবে। ঘুরতে ঘুরতে হয়তো সেটেল হয়ে যাবে একসময়।

এখানেতো [বাংলাদেশে] এখন অনেক নিপীড়ন। প্রতিনিয়ত মেয়েরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে- যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে.. মাঠে কাজ করতে যেয়ে। স্থানীয় লোকজন, জোতদারদের হাতে এই নির্যাতন হচ্ছে... যেহেতু বিচার হচ্ছেনা..বিচার চেয়ে লাভ নেই জেনে অনেকে নিরবে হজম করছে সেসব...মানুষ যখন গরীব হয়ে যায় তখন তার আর কোন মূল্য থাকেনা, মূল্য থাকে?.. তখন হয় সব কিছু দিয়ে দিতে হবে অথবা যুদ্ধ করে মরে যেতে হবে অথবা..পালিয়ে বাঁচতে হবে.. তো পালানোর তো আর জায়গা নাই। ..কেননা আদিবাসীদের স্বতন্ত্র গ্রামগুলো আগে যেভাবে ছিল এখন সেভাবে দেখা যায়না। গ্রামের মধ্যে কিন্তু বাঙ্গালিরা ঢুকে পড়েছে। স্বতন্ত্র গ্রাম পাড়াগুলো কিন্তু এখন নেই। স্বতন্ত্র জীবন যাপন কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। ..

প্রথম দিকে, মিশন আসলেও প্রথম দিকে একটা স্বতন্ত্র জীবন যাপন থেকেছে। প্রথমে মিশনের সাথে সংস্রব কম ছিল। সমাজ চ্যুতদের প্রথমে মিশন রিক্রুট করেছে। আমি শুনেছি যাদের ডাইনী ..বলা হয়েছে ..বা যারা একগোত্রে বিয়ে করেছে, সমাজের নিয়ম ভেঙ্গেছে। এরাই প্রথম আশ্রয় নেয়।

জিতু সাঁওতালরা মিশনের ধার ধারেনাই। তবে হিন্দুরা এটাকে একটা আবরণ দিতে চেষ্টা করেছে। (আদিনা মসজিদ দখল প্রশ্নে) রঙ দিতে চেয়েছে।

*প্রশ্ন: কমন প্রপার্টিবা যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ কি উত্তর বঙ্গের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক?*

> উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা আমরা একথাটা বলিনাই।...আমরা বলেছি সুস্পষ্টভাবে যে যেসব জমি জাল হয়েছে, বেনামীতে দখল হয়েছে, ভুয়া দলিল হয়েছে সেগুলো বাতিলের দাবী জানিয়েছি। আর উত্তরবঙ্গে ঐরকম যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ তো নাই। আমরা দেখি নাই। যৌথ বলতে কবরস্থান।

*প্রশ্ন: কমন প্রপাটির বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই আলোচিত হলেও এই বিষয়টি একেক জন এক এক ভাবে বুঝে থাকে।*

তবে গ্রাম পত্তনের সময় জমিকে কেন্দ্র করেই হয়। তখন মান্‌ঝির নেতৃত্বেই জমির ভাগ হয়। ..সাঁওতালদের পাড়াগুলোতে মাঝখানে রাস্তা। দুই দিকে বাড়ি । এটাই ঐতিহ্য। বাড়ি গুলো যেভাবে সাজানো হয়, জমিও সেভাবে পত্তন করা হয় লাইন বরাবর। জমির রেকর্ডও হয়েছে সেভাবে।

.. পশ্চিমবঙ্গেও এমনটাই দেখা যায়। আমাদের পাড়াটাও এভাবেই ছিল। এখন ভেঙ্গে গেছে। নবাবগঞ্জে এখনও এরকম পাড়া পাওয়া যাবে। ..বনজঙ্গলের ভেতর গ্রাম পত্তনের এরকমই করা হয়েছিল। নাচ গানের সুবিধার জন্যই এটা করা হয়।

বাংলাদেশে সরকার আদিবাসীদের জন্য কিছু করছেনা। পশ্চিমবঙ্গের সরকার আদিবাসীদের জন্য দায়িত্ব নিয়েছে। সেখানে নেতৃত্বে সাঁওতাল, বর্মন, ওরাও থেকে প্রতিনিধি আছে। মন্ত্রী এমএলএ আছে। ১৯ ডিষ্ট্রিকটের মধ্যে ৫/৬ টা জেলা পরিষদে সভাপতি আদিবাসী। নেতৃত্বের বেশীরভাগ ভারতের বাম পন্থার সাথে যুক্ত। আদিবাসীরা ধর্মান্ধ দলের সাথে যুক্ত হতে চায়নি। চেষ্টা হয়েছিল। ঝাড়খন্ডের প্রথম চীফ মিনিষ্টার বিজেপির ছিল। তখন বিজেপি ক্ষমতায়। কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি।

..বাংলাদেশে আদিবাসীদের মধ্যে অওয়ামী লীগের সমর্থন বেশী। সেটা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক। বামপন্থীদের সাথেও আদিবাসীরা আছে। ... ভারতে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচীর মধ্যেই আদিবাসীদের প্রশ্নটা আছে। বাংলাদেশে তা দেখা যায়না। [সাক্ষাৎকারের সময়কাল ২০/০২/০৮]

*লেখক: শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

# Chittagong Hill Tracts (CHT) Conflict: Parties, Causes and Solution

**Anurug Chakma**[1]

Conflict analysis is an ongoing process as the situation develops, factors, dynamics, and circumstances change. It can be done with the help of a good number of simple, practical, and adaptable tools and techniques. Some of these tools and techniques used here for analyzing the CHT conflict are as followings (Fisher, Abdi, Ludin, Smith, Williams & Williams, 2000; 18).

1. Stages of conflict
2. The ABC (Attitudes, Behavior, and Context) Triangle
3. The Conflict Tree.

## Stages of Conflict

Conflict changes over time. The conflict in the past may not be similar to the same conflict happening in the present. New dimensions, new actors, new interest, and new dynamics may be added. Generally, a conflict takes place within five stages: Pre-Conflict, Confrontation, Crisis, Outcome, and Post-conflict.

## Pre-Conflict

Bangladesh became independent in 1971. With the emergence of Bangladesh the CHT conflict emerges. A delegation of hilly people under the leadership of M N Larma met Mujib, then Prime Minister and claimed four points' demands but PM Mujib refused. Thus the incompatibility of goals between Parbatya Chattagram Jana Sanhati Samiti (PCJSS) and Bangladesh government comes into manifestation which eventually led to open conflict.

---

[1] Anurug Chakma is a Lecturer at the Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhaka. His e-mail address is: anurug.pacs_du@yahoo.com .

**Figure-1: Stages of CHT Conflict**
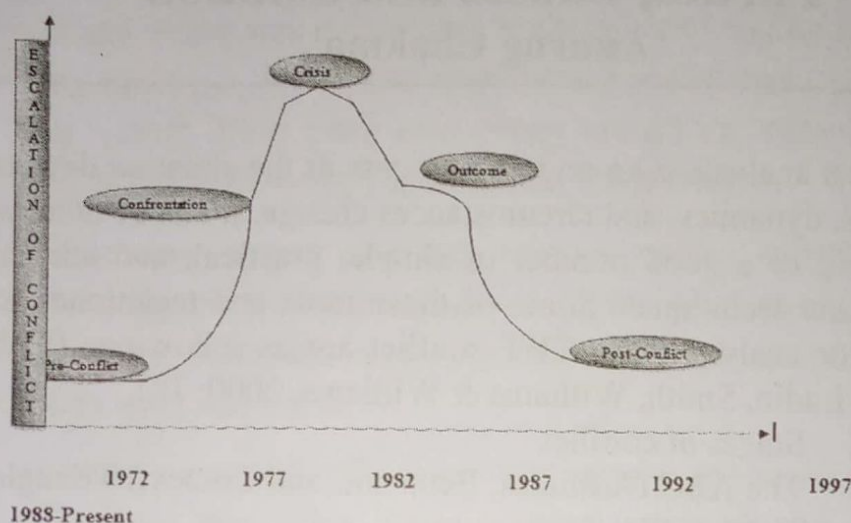
## Confrontation

When Sheikh Mujib was assassinated on August 15, 1975, military came to power to the country. PCJSS went underground and the Shanti Bahini, the military wing of the PCJSS, started armed struggle. On the contrary, military government wanted the solution of the conflict from militaristic point of view. For this reason, the government set up many army camps and turned the whole region a cantonment with an eye to counter insurgency of Shanti Bahini (SB). Thus the conflict has become more open.

## Crisis

The conflict entered into the stage of confrontation and crisis when Shanti Bahini made an attack on Bangladesh army in 1977. The situation became worse when Bangladesh government, in the period of 1979-1982, rehabilitated around more than 400, 000 Bengalis from plain lands. The tension and violence became more intense and widespread in the period of 1977-1992. People

on both sides were killed. Normal relations between both sides ceased. Public statements tended to be in the form of accusations made against the other side.

**Outcome**

A conflict, in general, has three outcomes: (i) victory of one party, defeat of the other, (ii) cease-fire, and (iii) negotiation settlement, or resolution. In case of CHT conflict, negotiation started in the mid-1980, five rounds of dialogue were held in the period of 1985-88 between the Bangladesh government and the PCJSS but no fruitful result came from these dialogues. The negotiation process suddenly became deadlock when the Ershad government without the consent of the PCJSS, placed three bills before the parliament. The BNP regime (1991-1996) continued it. A parliamentary committee with the task of continuing dialogue bètween PCJSS and Bangladesh government was created which was headed by Oli Ahmed. The first talk between this committee and PCJSS was held in November, 1992 and since then seven rounds of talk were held. In the seventh dialogue a sub-committee was constituted which was chaired by Rashed Khan Menon. Rashed Khan Menon met and discussed with the PCJSS about six times. Even after thirteen rounds of talks the two parties could not conclude a mutually accepted agreement although there were some significant developments such as- cease-fire, release of prisoners, question of tolls, tax, and repatriation of refugees from India. In 1996 parliamentary election, Awami League won and took the power to rule the country. After forming the government, the Awami League regime a parliamentary committee was formed headed by Abul Hasnat Abdullah. After the seven rounds of talks, the then AL government, in the long run, undertook a landmark action through concluding an agreement named "CHT Accord" in 1997 (Chowdhury, 2001; 87-108)..

**Post-Conflict**

If the issues and problems arising from their incompatible goals have not been adequately addressed, this stage could eventually lead back into another pre-conflict situation (Fisher, Abdi, Ludin, Smith, Williams & Williams, 2000; 19).

This is true for the CHT conflict. The hilly people cannot enjoy their rights, especially the right to life, liberty and security, right to enjoy regional autonomy, right to property, right to education through mother tongue, right to freedom of movement, and right to free from arbitrary arrest and torture. Their constitutional recognition has not still guaranteed. Refugees who have come back to the country have not got their grabbed land. Rather, it is found in different times of post-accord period that Bengali settlers are grabbing the land of CHT indigenous peoples. The 'Operation Uttoran' has empowered the army to arrest anybody arbitrarily. Bengali settlers with the help of security forces are attacking on indigenous villages. J B Larma, Chairman of PCJSS as well as CHT Regional Council (The Organization created according to the provision of CHT Accord), claims in many meetings, public address, press briefing, conferences that PCJSS would start armed struggle again if the CHT Accord is not implemented thoroughly.

**ABC Triangle**

A conflict situation has three components: the Context, or Situation, the Behavior of those involves and their attitudes. Interestingly, these three factors influence each other. In terms of CHT conflict, these three components are present. Therefore, the ABC (Attitudes, Behavior, and Context) triangle was applied in analyzing the CHT conflict (Mitchell, 1981).

## Figure-2: ABC Triangle
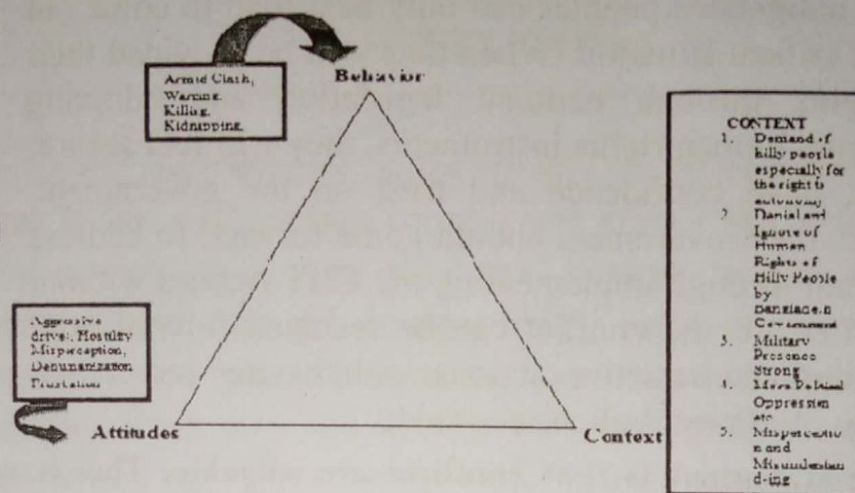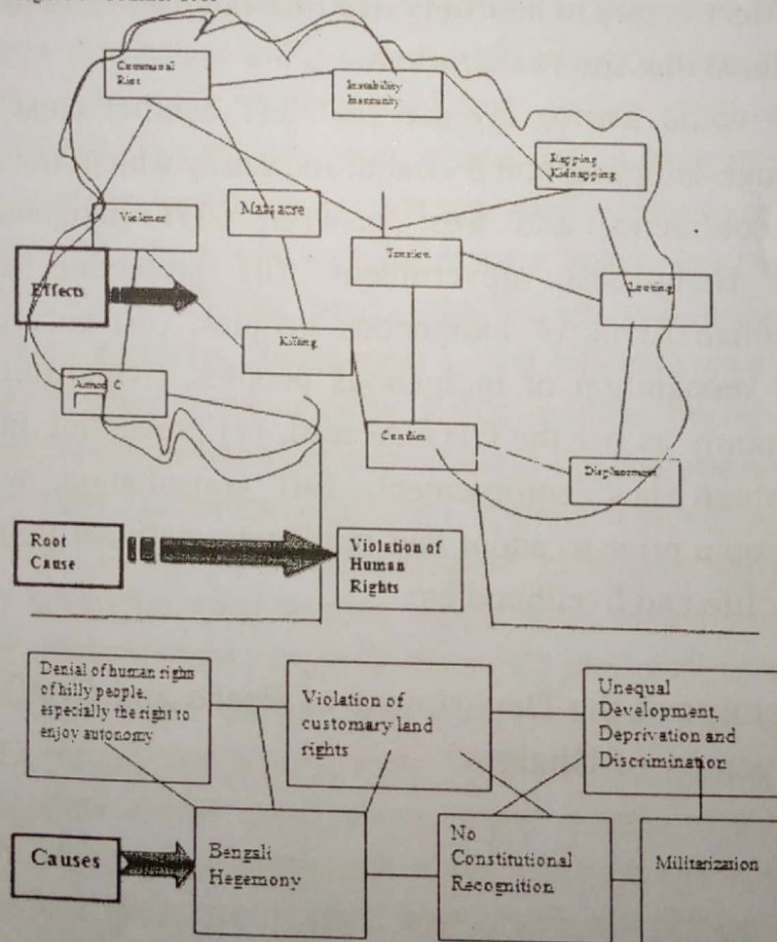
Source: Fisher, Abdi, Ludin, Smith, Williams & Williams, 2000.

It can be insisted that protection and promotion of human rights of indigenous peoples can only be a road to come out from this critical situation. When they will be provided their basic rights through national legislation and adopting international human rights instruments, they will feel secure; they will have confidence and trust on the government. Therefore, the Government should come forward to address the problem through implementing the CHT Accord without delay. After all, the conflict can be resolved fully if both parties adopt constructive actions with having respect on each other. As Peter Wallensteen said;

**A strong statement is that conflicts are solvable. This is not necessarily an idealistic or optimistic position. It is a realistic proposition. Most actors in conflicts will find themselves in need of negotiations at one time or another.**

Last of all, I would like to say that the CHT conflict must be resolved through adopting some crucial measures which are: (i) establishing confidence and trust between CHT indigenous peoples and Bangladesh government, (ii) protecting and promoting human rights of indigenous peoples, (iii) ensuring constitutional recognition of indigenous peoples, (iv) ensuring regional autonomy as per the CHT Accord, (v) preventing land grabbing through law enforcement, (vi) consultation with indigenous people prior to adopt and implement national policy affecting their life and livelihood etc.

*Writer: Lecturer at the Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhaka

# কবি ও কবিতা : পার্বত্য চট্টগ্রাম

## ড. আফসার আহমদ

সুসময় চাকমা ফোনে জানালেন, ৩০ শে আগস্ট ২০১৪ তারিখ দিনব্যাপী কবি ও কবিতা বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার কবিরা আসবেন। তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হবে। সুসময়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে শুক্রবার সারারাত বাসে ঘুমে জাগরনে, শনিবার ভোরে অবশেষে খাগড়াছড়ি পৌঁছালাম। আমার জন্য সেই ভোরে বন্ধু সুসময় চাকমা বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিলেন। সুসময় এখন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সস্টিটিউট খাগড়াছড়ির পরিচালক। ওর সঙ্গে গাড়িতে মিলনপুর গাইরিং অতিথি নিবাসে পৌঁছে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। পাহাড়ের ভোর অন্যরকম লাগে আমার সমতলি চোখে। শহর তখনও জেগে ওঠেনি। আমি শান্ত সুন্দর খাগড়াছড়ি দেখলাম অনেকদিন পরে। এবারের আসা কবি ও কবিতা বিষয়ক একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য। তিন পার্বত্য জেলার কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হবেন আজ সাংস্কৃতিক ইন্সস্টিটিউটের মিলনায়তনে। সুসময় আমাকে আমন্ত্রণ জানাতেই রাজি হয়েছিলাম বলে এখন নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। আমার জানা ও চেনা পার্বত্য এলাকার উলেখযোগ্য গুণি মানুষদের সম্মেলনে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছি অনেক বছর। আমার লেখা যেসকল পণ্ডিতের লেখা ও দিক নির্দেশনায় সমৃদ্ধ সেই মানুষদের অনেকেই হাজির হয়েছেন। সকাল দশটায় কন্যাসমা তিয়াশা চাকমা, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক আমাকে অতিথি নিবাস থেকে মিলনায়তনে নিয়ে গেল। তিয়াশাও আজকের সেমিনারে একজন আলোচক। চমৎকার করে সাজানো সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে উপস্থিত হতেই দেখা হলো খাগড়াছড়ির মারমা সংস্কৃতির অগ্রদূত অংশুই মারমার সঙ্গে। তিনি আমার সকল লেখাই পড়েছেন। সদালাপী এই মানুষটি তাঁর অমায়িক আচরণে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। লম্বা কড়িডোর দিয়ে যেতে যেতে কথা হলো কৃষ্ণচন্দ্র চাকমার সাথে। শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের নির্বাহী কর্মকর্তা কৃষ্ণচন্দ্র নিজে কবি ও সাহিত্যরসিক একজন মানুষ। চাকমা সংস্কৃতি ও সাহিত্য উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা রয়েছে। হলঘরে গিয়ে দেখা পেলাম পার্বত্য অঞ্চলের উজ্জ্বল বিবিধজনদের। কবি ও নাট্যকার মৃত্তিকা চাকমা, চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের নিষ্ঠাবান গবেষক ও কবি সুগত চাকমা, নিরীক্ষামূলক কবিতার রচয়িতা শিশির চাকমা, ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত দিঘীনালার আনন্দময় চাকমা, প্রবীণ পণ্ডিত মধুমঙ্গল চাকমা, বাংলা একাডেমী

পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক প্রভাংশু ত্রিপুরা, শ্রীলা তালুকদার, সীমা দেওয়ান, ড. আজাদ বুলবুল এমনি অনেক গুণিজনের কলরবে মুখরিত মিলনায়তন। এদের নিরলস লেখালেখির মধ্যদিয়েই শত প্রতিকূলতার ভেতরেও পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী সাহিত্যের ক্রমাগত বিকাশ ঘটে চলেছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান চাইথো অং মারমা, যিনি নিজেও একজন কবি। নৃগোষ্ঠী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর এক বিপুল টান টের পাই তিনি যখন কথা বলছিলেন। যাঁরা মঞ্চে বসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই এমন মহতী আয়োজনের জন্য প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করছিলেন। আসলেও তাই, এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন এখন সারাদেশেই প্রায় বিরল। সেখানে খাগড়াছড়িতে এমন একটি সেমিনার আয়োজন করেছে সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট তা কম কথা নয়। আমি না এলে জানতেই পারতামনা কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে পার্বত্য অঞ্চলের সাহিত্য। পার্বত্য অঞ্চলের প্রবীণ ও তরুণ কবিরা দেশ ও দেশের মানুষের আশা ও সংগ্রামের, প্রেম ও দ্রোহের বাণীকে নতুনকালের কাব্যভাষায় রূপ দিচ্ছেন। আমার চোখে আশা জাগানিয়া নতুন স্বপ্ন ভাসে।

**কবি ও কবিতা** *: পার্বত্য চট্টগ্রাম* শীর্ষক এই সেমিনারে সুগত চাকমার **প্রসঙ্গ : চাকমা কবি ও কবিতা**, চিংলামং চৌধুরীর **মারমা কবি ও কবিতা** এবং মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার **ককবরক কাব্যচর্চার বর্তমান হালচাল**– এই মোট তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়েছে। প্রবন্ধ পাঠের পরে শুরু হয় মুক্ত আলোচনা। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা পাঠ, চাকমা লোকশিল্পীর বেহালা বাদন অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যোগ করে। পঠিত প্রত্যেকটি প্রবন্ধই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। বিশেষ করে সুগত চাকমা ও চিংলামং চৌধুরীর প্রবন্ধ দুটি চাকমা ও মারমা জাতির সাহিত্যচর্চার পূর্বাপর আলোচনায় সমৃদ্ধ। সুগত চাকমা এমনিতেই অত্যন্ত উঁচুমানের গবেষক ও কবি। তিনি শুধু চাকমা জাতির নন, এই দেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক। তাঁর সকল লেখার সাথেই আমি পরিচিত। তাঁর আজকের লেখাটি খুবই ভিন্নতর মনে হয়েছে আমার। কারণ এই লেখায় একজন কবি হিসেবে তাঁকে নিজের নামটিও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। নিজেকে মূল্যায়ন করে প্রবন্ধ লেখা একজন কবির জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ। সুগত চাকমা নিজেকে পাশ কাটিয়ে এবং আড়েঠারে চমৎকার নিরপেক্ষতায় চাকমা কবিতার বাকবদলের, রূপান্তরের ও পরিবর্তনের ইতিহাস বলে গেলেন। আমি চাকমা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে চাকমা সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন একটি পথ খোলা নেই যে পথে সুগত চাকমা হাঁটেননি। তাঁর আজকের লেখা প্রবন্ধ শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে আমি কেবলি ভাবছিলাম সুগত বাবু কেন চাকমা সাহিত্যের যুগবিভাজন

নিয়ে কথা বলেননি। যদিও তিনি চাকমা কবিতার আদি থেকে এ পর্যন্ত বিশদ বর্ণনা করেছেন। তাই আধুনিক চাকমা কবিতার প্রাসঙ্গিকতায় চাকমা সাহিত্যের প্রাচীন কবি শিবচরণের **গোজেনের লামা** আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই যুগবিভাজনটি স্পষ্ট করলে বৃহত্তর পাঠকসমাজ জানতে পারতেন চাকমা সাহিত্যও কম পুরানো নয়। চাকমা ভাষার সঙ্গে বাঙলা ভাষার সম্পর্কওতো ঘনিষ্ট। মঞ্চে বসে আমি সুগত চাকমার প্রবন্ধ শুনতে শুনতে ভাবছিলাম আমার প্রয়াত বন্ধু সুহৃদ চাকমার কথা। সুহৃদ বেঁচে থাকলে সে হতো চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের আরেক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। আধুনিক চাকমা কবিতার পূর্ণতা প্রাপ্তিতে সুহৃদের অবদান অপরিসীম। সুহৃদের প্রসঙ্গ সুগত চাকমার লেখায় রয়েছে। তবে সুহৃদের আলোচনা আরও বেশি থাকাটা দরকার ছিল। সুহৃদ নিজেও চাকমা সাহিত্যের একটা যুগবিভাজন করেছেন। আমি তাঁর যুগবিভাজনকে স্মরণে রেখে চাকমা সাহিত্যের একটা নব যুগবিভাজন করেছিলাম। আমি দেখাতে চেয়েছি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে তার মতই একটি অগ্রযাত্রা চাকমা কবিতার শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার বিকাশ তেমন করে ঘটেনি। এ নিয়ে সুহৃদের আক্ষেপ ছিল। আমার বন্ধু সুসময়, খাগড়াছড়ি সাংস্কৃতিক ইন্সস্টিটিউটের বর্তমান পরিচালক, আমরা সেই আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি সুহৃদকে অনুসরণ করে চাকমাদের এদেশে অভিবাসনের নিরিখে একটি সাহিত্যিক যুগবিভাজন করেছি। এর মূল নিয়ামক ছিল আমার কাছে চাকমা বারোমাসী সাহিত্য। আমরাতো জানি, চাকমা বারোমাসী সাহিত্যের উদ্ভবের পেছনে বাঙলা বারোমাসী সাহিত্যের ভূমিকা ব্যাপকতর। চাকমা বারমাসী পালাসমূহ মূলত মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের বারমাসীর অনুকরণে রচিত। চাকমা বারমাসী ও মধ্যযুগের বাঙলা বারমাসী সাহিত্যধারার মধ্যে যুগ বিভাজনগত একটি মিল পরিলক্ষিত। বাঙলা ও চাকমা বারমাসী আখ্যানধারার উদ্ভব মধ্যযুগে। তবে বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ এবং চাকমা সাহিত্যের মধ্যযুগের মধ্যে কালগত ব্যবধান রয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের আদিমধ্যযুগের স্থিতিকাল পণ্ডিতগণ ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং অন্ত-মধ্য বাঙ্গালার স্থিতিকাল ১৬০১ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুমান করেন। বাঙলা সাহিত্যের যুগ বিভাজনের দিক থেকে বিবেচনা করা হলে স্বাভাবিকভাবেই চাকমা সাহিত্যের মধ্যযুগ আরও পরবর্তীকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কারণ চাকমা ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্র রীতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার পথে দীর্ঘ ও অস্থিতিশীল কঠিন সময় অতিক্রম করেছে। সঙ্গত কারণেই চাকমা নৃগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিকাশ এবং তার ভাষা ও সাহিত্যশৈলী গঠনের জন্য পার্শ্ববর্তী কোন শক্তিশালী জাতি ও সাহিত্যের অনুগামী হতে হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় রেখে

বলা যায় মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য যখন পূর্ণ প্রকাশে উদ্ভাসিত তখনও চাকমা নৃগোষ্ঠী সাহিত্যধারা তার প্রাচীনত্বের খোলস থেকে উন্মুক্ত হতে পারে নি। তাই চাকমা সাহিত্যের মধ্যযুগ উনবিংশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। এরকম একটি বিবেচনা থেকে আমি চাকমা সাহিত্যের যুগবিভাজন করেছিলাম। আমি দেখেছি ভাষা কিংবা সাহিত্য কোনদিক থেকেই চাকমারা কম সমৃদ্ধ নয়। আজ যদি তাদের একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ থাকতো তারাও হত সমৃদ্ধ সাহিত্যের ধারক বাহক। যাহোক আমি চাকমা নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও ভাষা বিচারের কালগত মানদণ্ডে চাকমা সাহিত্যকে চারটি প্রধান যুগে বিভক্ত করেছিলাম আমার গবেষণায়। সুহৃদ চাকমার অবর্তমানে আমার প্রিয়বন্ধু সুসময়, যাঁর অন্তরে বন্ধুপ্রীতির ফল্গুধারা সতত প্রবহমান সে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। আমার বিবেচনায় চাকমা সাহিত্যের যুগবিভাজন এমনতর হওয়া সঙ্গত :

ক. প্রাচীন যুগ (আনুমানিক ১১০০- ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)

খ. আদি মধ্যযুগ (আনুমানিক ১৩০০ - ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ)

গ. অন্ত্যমধ্যযুগ (আনুমানিক ১৬০০ - ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ)

ঘ. আধুনিক যুগ (১৯০০- বর্তমান সময়)

আমার বিবেচনায় চাকমা সাহিত্যের যুগবিভাজনটি আধুনিক কালের তরুণ কবিদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে। ঐতিহ্যবিমুখতায় বঞ্চণা আছে আনন্দ নেই– এই কথাটি সুগত চাকমা তুলে ধরার জন্যই যেন আধুনিক কবিতা আলোচনায় নেমে প্রাসঙ্গিকভাবেই চাকমাদের ধর্মসম্পৃক্ত সাহিত্য *গোজেনের লামা* এর উলেখ করেছেন। চাকমা কবিতার আলোচনায়, বিশেষ করে আধুনিক চাকমা কবিতার আলোচনায় সুগত চাকমা গোজেনের লামার উলেখ না করলে বরং আমি ব্যথিত হতাম। গোজেনের লামা মূলত ধর্মীয় সাহিত্য কিন্তু জীবনের রং ও রসের কথকতা সেখানে উপেক্ষিত হয়নি। এই কবিতামালায়, যেখানে ধর্মের প্রাধান্য সেখানেও জীবনের রূপ, রং ও রেখার সম্মিলনে রচিত বারমাসী সাহিত্যের কথা উঠে এসেছে। মৃত্যুপথযাত্রীর কানে বারমাসী সাহিত্যের কথা শোনালে তার আত্মা শান্তি লাভ করে। তাই চাকমা জীবনবাদী সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বারমাসীর উল্লেখ না করলেই নয়। আধুনিক চাকমা কবিরা এই সাহিত্য ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত না হলে তাঁরা কখনোই আধুনিক কবি পদবাচ্য হতে পারবেননা। এজন্য আধুনিক কবিতার সংকলনে চাকমা সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে, তরুণ কবি, লেখক ও সংস্কৃতি কর্মীদের ঐতিহ্য সচেতন করার লক্ষে রাধামন-ধনপুদী, বারোমাসী, গোজেনের লামা থেকে কবিতা অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

চাকমা কবি ও নাট্যকার মৃত্তিকা চাকমার সঙ্গে কথা হয়েছে আধুনিক চাকমা কবিতার একটি কাব্যসংকলন যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশ করবো। ভাষাসাহিত্য প্রকাশনীর তরুণ প্রকাশক সোহেলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে রাজি হয়েছে এমত একটি ঐতিহাসিক প্রকাশনার সঙ্গে তাঁর প্রকাশনা যুক্ত থাকবে। সেই সংকলিত কাব্যগ্রন্থে গোজেনের লামা, বারমাসী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেসকল চাকমা কবি কবিতা লিখেছেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রাচীন চাকমা কবিদের লেখা নেওয়ার কারণ শুধু ইতিহাসগত পারম্পর্য রক্ষা করাই নয়, দেখবো আধুনিক চাকমা কবিদের থেকেও কত সাহসী উচ্চারণ করেছেন সেই প্রাচীন চাকমা কবিরা। সুগত চাকমা তাঁর এই আধুনিক কবিতার আলোচনায় গোজেনের লামা তুলে এনে এমন একটি কাজ করেছেন যে জীবনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে গোজেনের লামা কমপক্ষে উদ্বুদ্ধকরণ করতে পেরেছে। গোজেনের লামার সঙ্গে, বিশেষ করে এর সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের শূন্যপুরাণের তুলনা আনতে পারি। জল থেকে পৃথিবী সৃষ্টির কথা রামাই পন্ডিতের শূন্যপুরাণে পাওয়া যায়। গারো নৃগোষ্ঠীর সৃষ্টিপুরাণেও কিভাবে প্রধান দেবতা তাতারারাবুকা জল থেকে পৃথিবী নির্মাণ করেছেন তার বর্ণনা রয়েছে। এসকল প্রাচীন প্রসঙ্গ আনার কারণ হয়তো এটাই যে সুগত চাকমা দেখাতে চেয়েছেন চাকমা আধুনিক কবিতার যাত্রা শুরুর আগের এই কাব্যশৈলীর ভেতরেও একটি জাতির জীবনজিজ্ঞাসা, দার্শনিকতা নান্দনিকতার উদ্বোধন ঘটেছিল।

সুগত চাকমার মতে চাকমা কবিতার আধুনিককালে প্রবেশ ঘটেছে ১৯২৬ সালে। কবি ফিরিং চান্দের লেখা 'আলঝি মিলার কবিতা' নামের কবিতার বই দিয়েই আধুনিক চাকমা কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চিত্রশিল্পী চুনিলাল দেওয়ান দেবস্তুতি থেকে সরে এসে চাকমা কবিতায় আধুনিকতার সূচনা করেন তাঁর প্রেমের কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটি চাকমা রানী বিনীতা রায়ের বঙ্গানুবাদসহ গৈরিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে রানী বিনীতা রায় আধুনিক চাকমা কবিতার বিকাশের সময়টিতে মাতৃচ্ছায়ারূপে বিরাজ করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্যা ছিলেন এবং কবির দেয়া নাম **গৈরিকা** দিয়েই আধুনিক এই কবিতা পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। সুগত চাকমা তাঁর প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে ফিরিং চান্দ, চুনীলাল দেওয়ান, মুকুন্দলাল তালুকদার, সলিল রায়, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, সুগত চাকমা, সুহৃদ চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা, শিশির চাকমা, সুসময় চাকমা, ফেলাজিয়া, পরিমল বিকাশ চাকমা, ভগদত্ত খীসা, সুপ্রিয় তালুকদার, সুকুমার চাকমা টুনটু, শ্যামল তালুকদার,

চাকমারাজা দেবাশীষ রায়, কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা, অমিতাভ চাকমা খোকন, কবিতা চাকমা, প্রগতি খীসা প্রমুখ কবিদের কবিতা আলোচনা করেছেন। তবে হয়তো প্রবন্ধের কলেবরের কথা বিবেচনা করেই তিনি একুশ শতকের চাকমা কবি, যাঁরা একেবারেই বয়সে তরুণ তাঁদের কবিতার আলোচনা করেননি। আশা করি তিনি একুশ শতকের তরুণ চাকমা কবিদের একটি তালিকা প্রকাশ করবেন এবং এই সময়ের কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করবেন। এই সময়ের কবিতায় দেখা যায় তরুণ কবিদের ভেতরে প্রেম, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, দেশের প্রতি ভালোবাসা, যুদ্ধ, আন্তর্জাতিকতাবোধ প্রবলভাবে উচ্চকিত। তবে বিষয়-বৈচিত্র্যের সাথে আঙ্গিকের গড়ন নিয়ে উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা এঁরা করেননি। যে নিরীক্ষা লভ্য আশির দশকের চাকমা কবিতায়। বিশেষ করে সুহৃদ চাকমা, শিশির চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা কিংবা সত্তর দশকের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও ফেলাজিয়ার কবিতায় আমরা এই নিরীক্ষার পরিচয় পাই। চাকমা কবিরা যদি চাকমা ভাষা নিয়ে, ভাষার স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে কিংবা এই ভাষায় গভীর তত্ত্ব ও প্রতীকময়তাকে অন্বেষণ করতেন তা হলে এই ভাষাটি কবিতার মাধ্যমে আধুনিক যুগজিজ্ঞাসাকে প্রকাশের জন্য আরও সংবেদী হয়ে উঠতে পারতো।

সত্তর দশকের পরে, চাকমা কবিতার বিষয় ও শৈলীর ক্ষেত্রে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটেছে। সত্তর উত্তর তরুণ কবিরা দেখেছেন কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন। কাপ্তাই বাঁধের প্রভাব পড়েছে আধুনিক চাকমা কবিদের চিন্তার উপর। ফলে কবিতার বিষয় ও শৈলীতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আশির দশকের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণের রাজনৈতিক সংক্ষুব্ধতাজাত সশস্ত্র সংগ্রামের প্রভাব এসে লাগে আধুনিক চাকমা কবিতার শরীরে। সুগত চাকমার বিশেষণ শুনতে শুনতে আমার তাৎক্ষণিকভাবে মনে হল যে সুহৃদ, শিশির, মৃত্তিকা যে নিরীক্ষা আশির দশকে শুরু করেছিলেন তার ধারাবাহিকতা কেন খণ্ডিত হলো সে আলোচনা সুগত বাবু করলে আমাদের জন্য বুঝতে সহায়ক হত। কারণ একথাতো সত্য যে, ১৯৭০ সালে সুগত চাকমা ননাধনের **রাঙামাত্যা** কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্যদিয়ে চাকমা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার যাত্রা শুরু হয়েছে। সুহৃদেও মতে, ইওরোপিয় ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে অনবরত সংঘাতের ফলে চাকমাদের যে সাংস্কৃতিক ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে তৎকালীন সেই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাকে ধারণ করার জন্যই সুগত চাকমা ননাধন আধুনিক। কিন্তু তারপরও সুগত চাকমা যুগযন্ত্রণাকে সঠিকভাবে তাঁর কবিতায় ধারণ করতে পারেননি বলে সুহৃদ (সুহৃদ চাকমার লেখা কবিতা ও আধুনিক চাকমা কবিতার পটভূমি দ্রষ্টব্য) মন্তব্য করেছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার

কালে, সেই আশির দশকে আমি লক্ষ করেছি কবিতা সম্পর্কে সুহৃদেও দৃষ্টিভঙ্গী খুব তীক্ষ্ণ ছিল। একটি লেখা অনেকবার কেটেকুটে আমাদের কাছে পাঠ করতেন। চাকমা জাতির সত্তার সংকটকে সুহৃদ গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। আমার কাছে সুহৃদের কবিতাকে সবসময় মনে হত শব্দের শিল্প। সুহৃদ শব্দ নিয়ে নিরীক্ষা করতেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে জন্মসূত্রে চাকমা ভাষার যে সম্বন্ধ তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সুহৃদ অনেক ভোটবর্মী ভাষা খুঁজেছেন, চাকমা ভাষাকে প্রতীকী করবার চেষ্টা করেছেন সে আমি সেই আশির দশকেই দেখেছি। প্রায় একই সময়ে সুহৃদ, শিশির, মৃত্তিকা, সুসময়- এদের যাত্রা শুরু। শিশির চাকমার কবিতায় একটি কাঠামোবাদ এর বিকাশ দেখি। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সময়ের সাথে সাথে বদলেছে। নারীপ্রেম ও স্বদেশ প্রেমের কবিতাকে তিনি একসময় পৌঁছে দিয়েছেন সর্বজাতির প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার কাছে। তাঁর কবিতায় জাতিসত্তার সমন্বয়ধর্মিতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিও চাকমা আলামে মিশে যায়। শিশির চাকমার কবিতায় একটি জাতিসত্তার ক্রমাগত বিলুপ্তির বেদনার অনুরণন।

সুগত চাকমা থেকে শুরু হওয়া আধুনিক চাকমা কবিতার নিরীক্ষার যুগ শেষ হলে পর এর ধারাবাহিকতা তেমন একটা চোখে পড়েনা। কবি ফেলাজিয়া ১৯৭৩ সনে লেখেন চাকমা কবিতার মোড় ফেরানো **জুম্মবী পরাণী মর** কবিতা। চাকমা কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার নতুন মাত্রালাভ করে। চাকমা পুরাণনির্ভর শব্দগুলো নতুন মাত্রা পায়। পাহাড়ি জীবন ও জনপদের সঙ্গে মিলেমিশে নবতর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে চাকমা কবিতা। সুহৃদ, সুসময়, মৃত্তিকা, শিশিরের কবিতায় জুম, পাহাড়ি ফুল, মোনঘর, চাকমা কাব্যের রাধামন-ধনপুদি প্রভৃতি শব্দ ও প্রসঙ্গ ভিন্নতর আবহ নিয়ে আসে কবিতায়। অন্যদিকে ফেলাজিয়ার কবিতায় দেখি সেই অতীতকালের চম্পকনগরী ও কবি প্রেয়সী একাকার। ব্যক্তিপ্রেম ক্রমাগত কবিতার ভেতরে ঐতিহ্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে এবং পাঠকের ভেতরে ভাললাগার ঘোর তৈরি করে। অনেকটা জীবনানন্দের মেজাজ যেন। কবি যখন বলেন, *সাগরর পানি তর চোগ ভর/এভ যে এধক আঘে ন-হদ জানং মুই,/ন-হদ জানং মুই, কেঙেরি হারেলে তুই/বদাচোগী নুদী চোক নুদী হাঝি কুঝি নুদী নুদী রিনিচানাগান,/জুম্মবী কদে চাং এধক কেঙেরি হলে পঝাগে আ ধগেধাগে/যদেপদে কধা কদে বাঙালমিলা সান?/আহ মর পরাণর চম্পক নাগরী!/কদে চাং কমলে কেঙেরি কুধু তর মর এধকদিন ওইয়ে হারাহারি?/মোনমুরা ছরাছরি কদকিত্যা ঘুরিফিরি চিপ্পুরেপা আবাধা গরি/ভালকদিন পরে তুই মইধু এলে,/কদে চাং জুম্মবী পরাণী মর এধকদিন কুধু কুধু এলে?*

(বঙ্গানুবাদ : সুগত চাকমা)

সাগরের এত জল দুটি চোখে এখনও যে আছে হায়!/আমি তা জানিনা!/কবে তুমি সুনয়না, হারিয়েছ প্রিয় আঁখি, মায়াচোখ/কোমল কোমল চাহনী?/জুম্মবী, বলো প্রিয়া, সাজে লাজে কেন আজ কাঙালিনী বেশে?/আহা মোর চম্পা-প্রিয়া, কতকাল পরে দেখা হলো দুজনের?/কত পথ কত নদী, কত অরণ্য পেরিয়ে/আবার এসেছো হায় এতদিন পরে!

চাকমা কবিতায় এভাবে জীবনের বর্ণময়তা রঙে-রূপে বেড়ে উঠতে থাকে। পাহাড়ে দীর্ঘসময় ধরে যে সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছে তার প্রভাবও চাকমা কবিতায় পড়েছে। সেই ধারাবাহিকতা থেকে পাহাড় সম্পূর্ণ ছাড়া পায়নি। অন্তরালের সেই বেদনা মৃত্তিকার মন-মুরো কানি যার ( হৃদয়ে পাহাড় কাঁদে) কবিতায় এমনভাবে উঠে এসেছে-

*টুলুন-ও আর তুলিবের নেই, পাগোর ঝরি যেইয়ে/পানিও নেই বিঝুগুলো ভাঝেবার/মনানি-ও নেই, মনর চুমত ঘিবে পোরি ওই আঘে/কুধু যেই বর চেম, ভাঙি যেইয়ে সারেক ঘর আর গোই মাঝা/মনর উঝ কুধু তুলো যেম, পিন্যো আগে ঠেঙে-ঘেধে হারচ্যান/সিলে যেইযে ঘি-উখো মাধা, আর-/চোগো উৎ বারেই আঘে মালাআনি,/আগুন বাঝি আড়ি যার এ দেশর মন-মুরোনি।/এই কবুল খেয়ং বিঝুত মুই ন যেম./------- মুই উবোচ ওই থেম, মোনমুরা কানানির পোইদ্যানে।*

মৃত্তিকার কবিতায় চাকমা ভাষার বাইরের শব্দপ্রয়োগ তাঁর কবিতায় স্থিতিস্থাপকতা এনে দিয়েছে। আবেগ ও দ্রোহের ভার যথাযথভাবে বহন করতে পারে এমন শব্দ প্রয়োগের দিকে মৃত্তিকার ঝোঁক রয়েছে।

চাকমা সাহিত্যের, বিশেষ করে কবিতাচর্চার যে বিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে সুগত চাকমার মূল্যায়ন যথার্থ। তিনি তাঁর আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত কবিদের কবিতাকে মূল বিবেচনায় রেখেছেন। তাই একুশ শতকের আধুনিক চাকমা কবিতার ধারায় তরুণ কবিদের অবস্থান, কাব্যভাবনা এবং তাঁদের 'কমিটমেন্ট' নিয়ে তেমন একটা আলোচনা করেননি। সম্ভবত তিনি স্বতন্ত্রভাবে এবিষয়ে লিখবেন। সুগত চাকমার প্রবন্ধটি চাকমা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আমাদের ভাবনাকে শাণিত করবে। বাংলাদেশের কবিতার ধারায় চাকমা ভাষা ও কবিতা নতুন মাত্রা নিয়ে আসবে নিঃসন্দেহে। তবে এজন্য প্রয়োজন চাকমা কবিদের চেতনাগত প্রসার। চাকমা ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যকে স্পর্শ করার প্রবল ইচ্ছাকে ধারণ করে কবিদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রেম ও দ্রোহের যুগপত মিলনে আমাদের

পাহাড়ী জনগণের জীবন-জিজ্ঞাসা কবিতায় রূপ পাবে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, অধিকারবোধ, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কবিরাই থাকেন সামনের সারিতে। আমাকে দারুণভাবে আলোড়িত করে কবিতা চাকমার কবিতায় বিধৃত দ্রোহী মনোভাব। এই দ্রোহে বেদনা ও ভালোবাসা, আধিকার ও অধিকারহীনতার সংক্ষুব্ধতা রয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ **'জুলি ন উধিম কিত্তেই' (১৯৯২)** থেকে একটি অংশ তুলে দেই-

*জুলি ন উধিম কিত্তেই!/যিয়ান পরানে কয় সিয়েন গরিবে-/বযত্তান বানেবে বিরানভূমি,/গাভুর বেলরে সাঝ/সরয মিলেরে ভাচ/জুলি ন উধিম কিত্তেই!*

(বঙ্গানুবাদ)

রুখে দাঁড়াবো না কেন!/যা ইচ্ছে তাই করবে-/বসত বিরানভূমি/নিবিড় অরণ্য মরুভূমি,/সকালকে সন্ধ্যা/ফলবতীকে বন্ধ্যা/রুখে দাঁড়াবো না কেন!

মঞ্চে বসে, সুগত চাকমার এই সুখপাঠ্য গদ্যে রচিত প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে আমি চাকমা জাতিসত্তার গভীরে ডুবে যেতে থাকি। সেই যে কিংবদন্তীর বিজয়গিরি রাজা থেকে ছুটে চলা শুরু হয়েছে আজও কি তার শেষ নেই! আমি ভাবি, রূপান্তরের বাকবদলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে চাকমারা সেই কবে থেকে। এই রূপান্তরে সুখ কিংবা স্বস্তি কতটা আছে জানিনা তবে কষ্ট যে অনেকটাই তা কবিদের কবিতা পড়ে বুঝতে পারি । একুশ শতকের একটি কবিতা, কবি প্রগতি খীসার লেখা (২০১২) **মন চিদ আহঙি যায়'** থেকে একটি অংশ তুলে দিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানবো।

*যুদি নু-ও জনম অহ্‌য়,/গাঙ, মুরো ন' অহ লে সাঝন্যা তারা ওহ্‌ই/পত্র ছদগ ওহ্‌ম-/ন' অহলে বলবলা বলি নয় ঝুবুর চিবিত গাঝ/তুও মুই আহন্দি রাজার রেজ্জ্যাত-/জনমেদুং নয় কন' জনমত।*

কবি প্রগতি খীসা তাঁর এই কবিতায় রূপান্তরিত জীবনের কথা বলছেন। তিনি উচ্চবৃক্ষ হতে চান, সন্ধ্যাতারা হতে চান, নদী-গিরি-ঝর্না হতে চান কিন্তু কোনোদিনই এই হতভাগা ভূমিতে জন্ম নিতে চান না। কবি রূপান্তর চান নিজের ভূমির বৃক্ষলতায় নদী পাহাড়ে। বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ কিংবা রূপান্তরবাদের একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার রূপান্তর ঘটেছে প্রগতি খীসার কবিতায়। ভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং ভূমিহীনতা কবিকে বেদনার্ত করে। আমার বিবেচনায় একুশ

শতকের চাকমা কবিতায় এই বিষয়টি ব্যক্তিপ্রেমের উর্ধে স্থান পাচ্ছে। আধুনিক চাকমা কবি ও কবিতার আলোচনাকালে সুগত চাকমা খুব সুন্দর করে চাকমা কবিতার আধুনিকতার মূল প্রণোদনাকে তুলে ধরতে পেরেছেন।

সুগত চাকমা প্রবন্ধ শেষ করার পরে মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা তাঁর প্রবন্ধ পড়লেন। **'ককবরক কাব্যচর্চার বর্তমান হালচাল'** শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধটিতে ত্রিপুরাভাষী কবিতা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা ককবরক সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মৌখিক ধারায় রচিত সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই ধারাটির উপর ভিত্তি করে আধুনিক ককবরক সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতার বিকাশ ঘটেনি। তিনি বাংলাদেশে ককবরক সাহিত্যচর্চার প্রথম নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন ১৯৪২ সালে লেখা খুশীকৃষ্ণ ত্রিপুরা রচিত গানের বই **'ত্রিপুরা খা-কাচাংমা খুম্বার বই'** গ্রন্থকে। আশির দশক থেকে ত্রিপুরারা নিজেদের ভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রয়াস পায়। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ককবরক কবিদের মধ্যে সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, বরেন ত্রিপুরা, মহেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, ব্রজনাথ রোয়াজা প্রমখের নাম উল্লেখযোগ্য। আশির দশক ত্রিপুরা ভাষায় কবিতা চর্চার জোয়ারযুগ। এই সময়ে প্রভাংশু ত্রিপুরা (বাংলা একাডেমী পুরষ্কারপ্রাপ্ত), প্রশান্ত ত্রিপুরা, কাবেরী ত্রিপুরা, সুরেন্দ্রনাথ রোয়াজা, দীনময় রোয়াজা, লাল দেনদাক, চিরঞ্জীব ত্রিপুরা, সুরেশ ত্রিপুরা, অনিলচন্দ্র ত্রিপুরা, মায়াদেবী ত্রিপুরা, কুহেলিকা ত্রিপুরা, উল্কা ত্রিপুরা, হিরন্ময় রোয়াজা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি। তবে এদের অধিকাংশই আর লেখার সাথে নেই। লেখালেখির মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে এখনও টিকে আছেন প্রভাংশু ত্রিপুরা, প্রশান্ত ত্রিপুরা, দীনময় রোয়াজা। মথুরা বিকাশ তাঁর লেখায় ১৯৯১ সালে প্রকাশিত **'সান্তআ'** নামের একটি সাহিত্য সাময়িকী যা প্রশান্ত ত্রিপুরার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে সেটিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। আমার বিবেচনায় পত্রিকাটি ককবরবক সাহিত্য চর্চার গুরচত্বপূর্ণ নিয়ামক। এই পত্রিকার সূত্র ধরে ককবরক ভাষায় লেখকগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। তবে মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা তাঁর লেখায় উল্লেখ করতে পারতেন বাঙলা ভাষায় কোন কোন ত্রিপুরা কবি সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছেন কিংবা করছেন কিনা। এই প্রবন্ধটি আমাদের জিজ্ঞাসাকে উচ্চকিত করবে নিঃসন্দেহে। তবে মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা প্রবন্ধটি আরও গুরুত্বের সাথে লিখলে এবং ত্রিপুরাভাষী কবিদের একটি তালিকা তৈরি করলে আমরা আরও উপকৃত হতাম। আমি প্রভাংশু ত্রিপুরার কথার সাথে সহমত পোষণ করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই। আজ প্রবন্ধ পাঠের শেষে প্রভাংশু ত্রিপুরা তাঁর কথাগুলো বলেন। কি যে সুন্দর আর সাবলীল তাঁর বলার রীতি, আমি মুগ্ধ। আগে কখনও তাঁর বক্তৃতা শুনিনি। তিনি বলেন কবিতার

পাঠযোগ্যতা বিষয়ে। কবিতায় মূলবাণী কিভাবে ধারন করতে হয় সেকথা বলেন তিনি। কবিতার যদি পাঠযোগ্যতা না থাকে তবে সেই কবিতা টিকে থাকে কি করে? কবিতার ভেতর দিয়ে জীবনকে, জগতকে স্পর্শ করার তাগিদ থাকতে হয়। প্রভাংশু ত্রিপুরার আলোচনায় কবিতার আন্তর্জাতিক প্রাণময়তা ও নির্যাসের বিষয়টি উঠে এসেছে। আমি ভাবি এমন লেখক যে জাতির রয়েছে তাঁর কবিতার বিকাশ না ঘটে কি পারে? ত্রিপুরা কবিরাই শুধু নয়, আমাদের তিনটি পার্বত্য জেলার কবিদের খেয়াল রাখা দরকার যে কবিতার সার্বজনীনতাকেই তুলে ধরতে হবে। এজন্য বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের দিকেও খেয়াল রাখলে কবি ও কবিতার মধ্যদিয়ে একই দেশে বসবাসরত শিল্পসাহিত্যে অনুরাগী পাঠকেরা শুধু পড়শী হয়ে থাকবেনা বন্ধু হতে পারবে। বাংলাদেশের সাহিত্য সার্বিকভাবে তাতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর সাহিত্যভাবনা বিষয়ক প্রবন্ধটির পরে তরুণ গবেষক চিংলামং চৌধুরী **মারমা কবি ও কবিতা** শিরোনামের প্রবন্ধ পাঠ করেন। চিংলামং অনেক পরিশ্রম করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। কারণ মারমা ভাষায় কবিতা রচনার সংখ্যা যেমন কম, কবির সংখ্যাও কম। এছাড়া খাগড়াছড়িতে বসবাস করে মারমা সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি ভাষাগত পার্থক্যের ফেরে পড়েছেন। বান্দরবানের মারমারা যে উচ্চারণ কিংবা রীতিতে কথা বলেন কিংবা লেখেন তারসঙ্গে খাগড়াছড়ির মারমা ভাষীদের খানিকটা পার্থক্য রয়েছে। চিংলামং এসকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মারমা কবি ও কবিতা সম্পর্কে একটি তথ্যনির্ভর আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক মারমা কবিতা যারা লিখছেন তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা। মারমা কবিদের লেখা কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। এমনকি কোন কবিতা সংকলনও নয়। বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য-সাময়িকীতে মারমা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাই আধুনিক মারমা কবিতার আলোচনা করা একটি দুরূহ কাজ বলেই আমার মনে হয়েছে। চিংলামং সেই অসাধ্য কাজটি করেছেন।

চিংলামং তাঁর প্রবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক বাঙলা কবিতার যাত্রা শুরুর আগে দীর্ঘ ব্যাপ্ত মধ্যযুগের সাহিত্যকে সঙ্গীত ও কবিতা রূপেই বিবেচনা করা হয়। বাঙলা কবিতা পাঠ যেমন হত তেমনি আসরে আসরে পরিবেশনা করা হত। এগুলো গেয়আখ্যান নামে পরিচিত। এই কাব্যধারা দুই রকম, একটি ধারা মৌখিক রীতির এবং অন্যটি লিখ্যরীতির সাহিত্য। এই প্রসঙ্গ স্মরণে রেখে চিংলামং মারমা কাব্যচর্চার ইতিহাস বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন। মারমা আধুনিক কবিতা চর্চার পূর্বে মারমা অধ্যুষিত অঞ্চলে মৌখিক রীতির কাব্যচর্চা

বিদ্যমান ছিল এবং এখনও রয়েছে। মারমাদের উল্লেখযোগ্য লোকগীতি হিসাবে কাইপ্যা ব্যাপক জনপ্রিয় মারমা নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত আরণ্যক জনপদে। পরিবেশনা ও আঙ্গিকের দিক থেকে অনেকটা বাঙলা কবিগানের মত এই কাইপ্যা। কাহিনীভিত্তিক হলেও জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ বেদনার কথা কাইপ্যার প্রাণমাতানো সুরে মহার্ঘ হয়ে ওঠে। মারমা জ্যা পালার অনেক চরিত্রের অন্তর্গত বেদনাবোধের সুরেলা প্রকাশের মধ্যে কাইপ্যার মন্ময় বেদনারই প্রতিফলন ঘটে ।

চিংলামং চৌধুরীর প্রবন্ধে মারমা মৌখিক রীতির লোকসাহিত্যের প্রসঙ্গের জের ধরে বলতে চাই যে এই লোকসাহিত্য মারমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় আধুনিক সাহিত্যের অগ্রযাত্রায় তার ভূমিকা নির্ণয় করা জরুরী। এসকল সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে আধুনিক মারমা কবিতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মারমা সমাজে কাইপ্যা, পাংখুং ব্যতীত আরও অনেক ধরনের সঙ্গীত ও গীতিনাট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য হল : চাগায়াং (মারমা সমাজে প্রচলিত এক ধরনের লোকগীতি), সাগ্রাং (এক প্রকার কাহিনীভিত্তিক লোকগীতি), রদুঃ (নির্দিষ্ট কোমল সুর ও ছন্দে পরিবেশিত একধরনের কাহিনীভিত্তিক মারমা লোকগীতি), লাংঙ্গা (নির্দিষ্ট সুরে আরণ্যক জনপদে প্রচলিত একধরনের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত), সাইংগ্যাই (বাঙলা জারীগানের মত তালে তালে একই সুরে ও ছন্দে দলীয়ভাবে একদল কর্তৃক অন্য দলের উদ্দেশে বিভিন্ন ধরনের বিবরণমূলক সঙ্গীত), লুংদি (গৌতম বুদ্ধের শৈশব ও যৌবনের কাহিনী নিয়ে একই সুরে রচিত এক ধরনের লোকসঙ্গীত। বিশেষ উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে), সাইংবক (ধর্মীয় সঙ্গীত), আফয়েঃ (বর্তমানে বিলুপ্ত এই লোকগীতি পূর্বে রাজাদের সামনে বেহালা বাজিয়ে পরিবেশন করা হত), সোইং আকাহ (বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে পরিবেশিত নৃত্যগীত) প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী নৃত্যগীত। এছাড়া ঙচোয়ে আকাহ (একধরনের গীতিনৃত্য। প্রাচীনকালে একজন শিল্পী মারমা সমাজ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণীগুলোকে নৃত্য ও গানে বাড়ি বাড়ি পরিবেশন করতেন। বর্তমানে বিলুপ্ত), লংবাই আকা (চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ উপলক্ষে নৃত্যগীত), ছিমুই খোয়ও আকা (ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নৃত্যগীত), নে-ছমুই (রূপকথা নির্ভর পরীনৃত্য), বুলু (মুখোশ নৃত্য) প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী নৃত্যগীত রয়েছে মারমাদের। প্রকৃতির সঙ্গে মারমা নৃগোষ্ঠীর অন্তর্লীন সংলগ্নতা এ সকল নৃত্যগীত ও নাট্য আঙ্গিকের মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাদের গোষ্ঠীগত ধ্যানধারণাপ্রসূত এ সকল নৃত্য, গীত ও নাটকে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়েছে। এসকল কবিতা আখ্যানধর্মী যেমন তেমনি ব্যক্তিগত বেদনা

আনন্দের আত্মগত অনুভূতিপ্রধানও। এগুলো অধিকাংশই পরিবেশন করা হতো আসরে আসরে কিংবা জুমের সময়ে কর্মের অবসরে। ফলে লোকগীতি নামে পরিচিত এই কাব্য বা সঙ্গীত যা-ই বলিনা কেন তাকে কবিতার সঙ্গে অদ্বৈত ভাবলেই মারমা কবিতার একটি পূর্বাপর ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। চিংলামং চৌধুরীর এই যুক্তিটি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। মারমা ভাষা বেশ সুরধর্মী। সুরের ভেতর দিয়ে যেন একটি জনগোষ্ঠীর আশা আনন্দকে স্পর্শ করার প্রয়াস পেয়েছেন কবিরা। জুমচাষের সময় দুই পাহাড়ে অবস্থানকারী যুবক-যুবতী তাদের মনের কথা প্রকাশ করে গানে গানে। তাৎক্ষণিকভাবে রচিত কিংবা চর্চিত গানের মধ্যদিয়ে তারা ভাবের আদান প্রদান করে। কাপ্যার ভেতরে মারমা নৃগোষ্ঠীর নরনারীর ব্যক্তিগত জীবন ও কৃষিকেন্দ্রিক জীবনভাবনার একটি আত্মগত মগ্নতার রূপ বিধৃত হয়েছে। চিংলামং এই বিষয়গুলো তাঁর আলোচনায় নিয়ে এসে মারমা কাব্যচর্চার প্রেক্ষাপটকে খুব পোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। মারমা ভাষায় যাঁরা আধুনিক কবিতা লিখছেন তাঁরা চিংলামং চৌধুরীর এই পরামর্শটি কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু সুরের বন্ধন থেকে কবিতার মুক্তি পাওয়ার যে লক্ষণটি চিংলামং আধুনিকতার চিহ্ন বিবেচনা করেছেন তা কিন্তু পাশ্চাত্যের ধারণা। এই ধারণার আলোকে কাব্যবিচার করতে গেলে শুধু নৃগোষ্ঠী কবিতাই নয়, বাঙলা কবিতাও আধুনিকতা থেকে অনেকদূরে অবস্থান করবে। মারমা কবিতাতো সেখানে দিকচিহ্নহীন অকূলে ভাসবে।

বান্দরবান সাংস্কৃতিক ইন্সস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত মারমা গানের সংকলনে গান পাঠ করেছিলাম অনেকদিন আগে। কিন্তু সংকলনটিকে গান হিসেবে না দেখলে তা চমৎকার কবিতা সংকলন হতে পারে। এসকল গানে কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে। সেটুকু বাদ দিলে বহু গানই চমৎকার কবিতা। ঐ যে শুরুতে বলেছিলাম মারমা জীবনে সুরের যে প্রভাব তা বাদ দিয়ে তার আধুনিক কবিতা এখনই রচনা সম্ভব নয়। সংকলনটিতে ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, হাসি, চাওয়া-পাওয়া কিংবা হতাশার কথা আছে। চ থুই ফ্রু এর লেখা **লাহ্ প্রংরে অখ্যিং মা** গানটিতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত একটি রাতে একজন প্রতীক্ষারত মানুষের হৃদয়বেদনার কথা উঠে এসেছে। কয়েকটি লাইন তুলে দেই-

*দে পইং লাহ্প্রং ওে অখ্যিং মা/কো খ্যসুগো এম্রে সিদিরা/তয়কতে থইংরো চং নিওে খ্যসুগা শাহ/আস্বা আস্বা কাখ্যাং আসাইং যাখা ক্রা ফোলে/মং গো খ্য রো যাখা থইংফোলে আনামা ॥*

(কবিকৃত বঙ্গানুবাদ)

এই চাঁদনী রাতে তোমায় পড়েছে মনে/একা বসে আছি এলে না তুমি/চুপিসারে কবে নূপুরের সুর তুলবে/কবে ভালোবেসে বসবে পাশে ॥

এস এ প্রু সম্পাদিত উপজাতীয় সংগীত পুস্তিকা প্রথম খণ্ডে এই মারমা গানগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে ক্য শৈ হ্লা, উ চ হ্লা, ক্য শৈ প্রু, চ থুই ফ্রু, ক্য মাং উ প্রমুখ গীতিকারের চব্বিশটি গান সংকলিত হয়েছে। চিংলামং এগুলোকে গান বিবেচনা করে হয়তো আলোচনায় আনেননি। এই প্রবন্ধে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলে পাঠকের মারমা কবিতার সুরধর্মিতা বুঝতে সুবিধা হত।

**কবি ও কবিতা : পার্বত্য চট্টগ্রাম** শীর্ষক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ও উপস্থিত কবি-বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা শুনে আমার নিকট স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী কবিতার যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে তা একদিন বিশ্বমানের হয়ে উঠবে। পাহাড়ী ভাষাগুলো কবিতার আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠবে। এই যে শুরু হল এটারই দরকার ছিল। বর্তমান বাংলাদেশে সাহিত্য সম্মেলন কিংবা এমন গঠনমূলক কবি ও কবিতা বিষয়ক সেমিনারের চল উঠেই গেছে বলা যায়। সুসময় চাকমা এমন একটি আয়োজন করেছেন বলে তিনি পার্বত্য অঞ্চলের কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা থেকে কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিতজনেরা এসেছেন। সম্মেলনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে পার্বত্য অঞ্চলে যাঁরা মাতৃভাষায় কবিতা লেখেন তাঁরা একটি পাটফর্মে মিলিত হয়েছেন। তিনটি অঞ্চলের ভিন্নভাষী কবিগণ পরস্পর মতবিনিময় করেছেন। কবি-বুদ্ধিজীবীরা খোলামেলাভাবে তাঁদের শিল্প ও রাষ্ট্রভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক বক্তাই ঐতিহ্যের সংলগ্ন হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আধুনিক কবিতার ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী কবিগণ, বিশেষ করে চাকমা কবিগণ যেভাবে নিজস্ব পথ অন্বেষণ করছেন তাতে তাঁরা যে একদিন নিশ্চিত আন্তর্জাতিক মানের কাব্যভূবনে পৌছাবেন সে ব্যাপরে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

* লেখক: সাবেক প্রো-ভিসি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

# যা-ই হবে হোক; না হোক!

## লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী আজ যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর অস্থিত্ব রক্ষা, বিভিন্ন অধিকার ও বিকাশের প্রশ্নে হৈ চৈ চলছে। ঠিক এ মুহূর্তে ক্ষুদ্র একটি জাতির অস্থিত্ব রক্ষা এজন্য প্রয়োজনীয় সংগাম চালিয়ে যাওয়া অথবা স্বেচ্ছায় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সগৌরবে দ্রুত বিনাশের পথে যাত্রা করা নিয়ে কিছু আলোচনা।

সুন্দর এ পৃথিবীর বুকে কোন ক্ষুদ্র জাতি/গোষ্ঠীর জনগন সুষ্ঠু সুন্দর ও নিরাপদে জীবন যাপন এবং উত্তরোত্তর বিকাশের জন্য নিম্ন কিছু শর্ত পালন করা আবশ্যক।

শর্তসমূহঃ

১। নিজস্ব ভাষা
২। নিজস্ব হরফ/অক্ষর
৩। নিজস্ব পোষাক
৪। শিক্ষা
৫। ভূমির অধিকার
৬। সংস্কৃতি
৭। সামাজিক রীতিনীতি
৮। ইতিহাস ও ঐতিহ্য
৯। সচেতনতা
১০। ঐক্য
১১। স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন পূরনে সঠিক নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়া।

এসব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিজের জাতির মধ্যে রক্ষিত হবে কি হবেনা এটি তাদের নির্মম বাস্তব কর্মফলের ব্যাপার।

কিন্তু একটি বিষয়ে মানুষ সাধারণতঃ খুব দুর্বল থাকে, সে যে সম্প্রদায় বা জাতি/গোষ্ঠীর হোক না কেন একজন যুবতী নারী যখন কোন পুরুষের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে, তখন থেকে ঐ পুরুষের মনে তোলপার শুরু হয়। আরও কিছু দিন পর সম্পর্কে গড়িয়ে যাওয়াতে ঐ যুবতী যখন উক্ত যুবকের গলায় জরিয়ে ধরে বলে যে, আমি তোমাকে জীবন দিয়ে ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবনা। তাহলে ঐ যুবকের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক অস্বীকার করা বা প্রস্তাব প্রত্যাখান করার মতো পথ থাকেনা। এজন্য লেখক সাহিত্যিকেরা বলেন

প্রেম অন্ধ হতে পারে তাহলে সেই মন্তব্যের সাথে আমি আরও একটা কথা যোগ করে দিই। তাহচ্ছে প্রেম অপরিনামদর্শী ও রোহিসেবী। ঐ যুবকটি তখন জীবনকে রঙিন দেখা শুরু করে। আর নিজের জাতির/পরিবারের স্টেটাসের থেকে একটু উন্নত/অগ্রসর হলেতো কথাই নেই। মা বাবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা সম্মতি-অসম্মতির কোন প্রশ্নই আসেনা। ভালবাসা বা প্রাণপণ ভালবাসাই তখন বড় হয়ে উঠে। ঐ পুরুষ তখন অত্যন্ত সংকীর্ণ স্বার্থে অন্ধ হয়ে যায়। উভয়েই অপরিনামদর্শী হয়ে অগ্রসর হতে থাকে। পরে যাই হবে হোক।

সে অবস্থায় ঐ পুরুষটির ভাবা উচিত, আমরা ক্ষুদ্র জাতি। আমাদের স্বকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আমার কর্মের দ্বারা তা কি ক্ষতি হতে যাচ্ছে/যাবে?

বিশ্ব ব্যাপী আজ যেখানে মাতৃ-ভাষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতির পরিচয়ের প্রবনতা শুরু হয়েছে, সে অবস্থায় ঐ দম্পতির (যদি বিয়ে হয়ে থাকে) সন্তানেরা স্বাভাবিক ভাবেই মায়ের মুখ উচ্চারিত ভাষায় কথা বলে থাকে, এবং ইহা জগতের সকল শিশুর জন্মগত অধিকার। তাহলে ঐ পুরুষ পেল কেবল নিজের সুখ শান্তি আর পেতে পারেন বৈষয়িক বিত্ত বৈভব। কিন্তু ঐ নারী পেল নিজের ভাষায় কথা বলার সন্তান সন্ততী। পিতৃ তান্ত্রিক সমাজ বলে যদিও সেই সন্তানেরা পিতৃ জাতের পরিচয় দেবে কিন্তু কথা বলবে মায়ের ভাষাতেই। আর এভাবে চলতে থাকলে ২/৩ পুরুষ পর পিতৃ(পুরুষের) ভাষার অবশিষ্ট অংশটুকু থাকবেনা।

সুতরাং পুরুষের দিক থেকে "চিনির প্রলেপে আচ্ছাদিত বোমার আঘাতে আহত" হবার ঘটনাই ঘটবে। একান্ত নিজের কিছু সুখ কিছু আরাম উপভোগের পরিবর্তে জাতির পরিচয় দিতে গিয়ে বেরিয়ে আসবে ভেজাল, হবে বুমেরাং।

আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় ভাই বছর দুই আগে তিনি স্বস্ত্রীক আমাদের গ্রামে বেরাতে আসলে পথিমধ্যে দেখা হয়। সে হেসে হেসে কথা বলল "দাদা আমি অমুক সম্প্রদায় থেকে বিয়ে করেছি। তার সাথে কথা বলতে বলতে আমার কথাও তার ভাষায় হয়ে যায়।" আমি ভিতরে ভিতরে তিরষ্কার করে বললাম "খুব ভালো কাজ করেছো।" এইতোঃ দেখুন; কোথায় পুত্র পৌত্রকে অপেক্ষা করবে, সে নিজেই ভাষাগত ভাবে স্ত্রী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। চিন্তা করুনঃ "হৃদয়ে হৃদয়ে দৃষ্টি যখন মেলে জাতি গোষ্ঠির স্বার্থের ব্যাথা তখন কি কারও মনে পড়ে?

তাইতো বলি;
নাহোক সকলে
জাতির অর্ধেক লোকে

যদি এমনি চলে,
আর কোন কথাই নাই
জাতির পরিচয়
দ্রুত যাবে রসাতলে।

প্রশ্ন আসতে পারে, আমাদের গোটা একটা জাতি থেকে দুই/একজন বা ২/১ টা পরিবার নাহয় বরবাদ গেল? তবে জাতির তাতে কি আসে যায়? উত্তর হ্যাঁ আসে যায়। সামাজিক কোন সভায় যেখানে আপনার বক্তব্য হতো সুচালো ও খুরাধার সদৃশ, এখন বক্তব্য দেবার সময় আপনার গাল থেকে যেন কিছু কথা ঝরে পরছে, অথবা কোন কথা বলতে যেন একটু সময় লাগছে। এরকমই হবে।

আমরা জানি শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আর আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। আপনি জাতির মেরুদন্ডের একটি অংশ স্বরূপ। আপনার চিন্তা কর্মব্যক্তিত্ব জাতির নিকট প্রভাব ফেলবে। তাকিয়ে দেখুন আপনার চারপার্শ্বে অগণিত মানুষ আপনার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। এখানে সার্বিক দিক দিয়ে দৃঢ়তার পরিচয় দিবেন? নাকি ভেড়ার মতো অসহায়ত্ব দেখাবেন?

আর কিছু লোক আছেন, উচ্চ শিক্ষিত হয়ে নিজ জাতি গোষ্ঠীকে ভুলে অনেক উপরে ওঠেন। সামগ্রিকভাবে প্রয়োজন জাতির অস্থিত্বের প্রতি সচেতনতা। গনচীনে যেখানে ১৭০ কোটি লোক হওয়া সত্ত্বেও কেবল সাংস্কৃতিক কারনেই বিদেশি মেয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং ইংল্যান্ডের যুবকেরাও সাংস্কৃতিক কারনেই বিদেশিদের বিয়ে করতে চায় না।

আমার কথা হলো উত্তাল যৌবনে উন্মত্ত আচরণ করবেন না। সংযত হোন গভীর ও যুক্তি সংগত ভাবে চিন্তা করে নিজের জীবন সঙ্গী/সঙ্গীনি নির্বাচন করুন। জাতির জন্য সুদূরপ্রসারি কোন ক্ষত সৃষ্টি করবেন না।আগে কে কি করেছেন, তাতে কি হয়েছে, এসব এখন জমা রাখুন। প্রথমে নিজেকে সংযত রাখুন। ভুল থেকে ভুল শিক্ষা নিবেন না। জাতির জন্য আপনি একজন সম্পদ ও শক্তি। এ সম্পদ ও শক্তি কে জাতির বিনাশের কাজে লাগাবেন না।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির মধ্যে একমাত্র কারআ গছার মহিলারা এখনো নিজস্ব মৌলিক পাঁচ কাপড় পরিধান করে বলতে পারে আমরা তঞ্চঙ্গ্যা। আমাদের মধ্যে ভেজাল নাই। অনান্য গোছার মধ্যে পূর্বে যদিও পঞ্চবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। স্থানকালের বিবর্তনে সংক্ষিপ্ত।

স্থান, কাল ও পরস্পরের যোগাযোগের অভাবে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফের মহিলাগণ এবং মায়ানমারের তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাগণ পাঁচ বছর থেকে এক বস্ত্র ব্যবহার করেন না। বা বুনতে জানেন না। তাদেরকে প্রথম সাক্ষাতে মনে হবে মারমা। অথচ মুখের ভাষা তঞ্চঙ্গ্যা।

এভাবে সংকীর্নতা রক্ষনশলতার অজুহাতে প্রশ্ন উঠতে পারে। না, এখানে জাতির পরিচয় ও অস্তিত্বের প্রশ্নে সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার প্রশ্ন আনা অযৌক্তিক। তাহলে "global world I global fashion" এর প্রবল জোয়ারের দিনেও বর্তমান পৃথিবীতে ৭০টি দেশের ৩৭ কোটি আদিবাসী মানুষের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের প্রশ্নই আসতোনা। ইহা অবশ্য ঠিক যে, অনেকেই অবশ্য যুক্তি দিতে পচ্ছন্দ করবেন নিজের আত্মরক্ষার স্বার্থে। এমন বিপরীত যুক্তিবাদীরা জাতীয় স্বার্থ থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। শেষ পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে যাবেন।

১। **নিজস্ব ভাষাঃ** আমরা তঞ্চঙ্গ্যারা বলতে গেলে স্বাভাবিক ভাবে খুব সহজ জাত। অত্যন্ত হৃদয়বান ও পরমত সহিষ্ণু। অন্য যে জাতের লোকের সাথে কথা হয় তার যাতে বুঝতে ও বলতে অসুবিধা না হয় সুতরাং নিজের ভাষায় কথা না বলে তার ভাষাতেই কথা বলতে চেষ্টা করি, সে যতটুকুই পারা যায়। যেমন চাকমা কারও সাথে কথা বলতে গেলে আমরা চাকমা ভাষা বলি, যারা মারমা জানেন তারা মারমাদের সাথে কথা বলার সময় মারমা ভাষা, চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের সাথে কথা বললে চিটাগাংয়ের ভাষায়, শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাথে কথা বললে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা ভাষায় কথা বলি। মানে তোমার ভাষার নিয়ে তোমার সাথে কথা বলে তোমায় বিদায় দিলাম, আমার ভাষা লুকিয়ে রাখলাম।

এজন্যই হয়তো ইদানিং কেউ কেউ বলতে থাকেন পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভাষাভাষীর এগরটি জাতি। কি আশ্চর্য! ভাষা ব্যতিত কোন জাত থাকতে পারে? হয়তো গভীর অনুসন্ধান ছাড়া, পঙ্খানুপঙ্খু কোন তথ্য সংগ্রহ ছাড়া দায় সারা সিদ্ধান্তে আসা অথবা কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এহেন প্রচার চালানো।

২। **নিজস্ব হরফ/ অক্ষরঃ** সুদূর প্রাচীন কাল হতে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে স্থানীয় গ্রাম্য চিকিৎসক বা বৈদ্যগণ নিজস্ব হরফ দিয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় মন্ত্র, দারু, তানিক ইত্যাদি লিখে রাখতেন। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি গঠিত হবার পর ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অব ডিসটেন্স এডুকেশনের সহকারী পরিচালক, বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ডঃ রূপক দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালার চার্ট এ্যাডভোকেট দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যার মাধ্যমে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা কমিটি পায়। কমিটি দেখে যে, দু'একটি ব্যতিত অধিকাংশ বর্ণ আমাদের বৈদ্যগণ

কর্তৃক ব্যবহৃত বর্ণের সাথে মিল আছে। এতে ভাষা কমিটির কাজে জোরালো সহায়ক হয়। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালায় ৫টি স্বরবর্ণ ও ৩১ টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে।

৩। **নিজস্ব পোষাক:** বিভিন্ন জাতির হাজার মহিলার মাঝখান থেকে খুব সহজেই বেছে নেওয়া যায় নিজ পোষাক পরিহিতা একজন তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাকে। তার কারন আমাদের মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী মৌলিক পাঁচ কাপড়। ইহা তঞ্চঙ্গ্যা জাতির অহংকার। "পোষাকেই পরিচিতি, পোষাকেই সংস্কৃতি।" বান্দরবানে এক সময়ের সম্মানিত সংসদ সদস্যা জনাব মাম্যচিং মারমা মহোদয়া যদি নিজের জাতীয় পোষাক পরে সংসদ অধিবেশনে যেতে পারেন তাহলে অন্তত জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতিমূলক কোন অনুষ্ঠানে আমরা নিজস্ব জাতীয় পোষাকের কথা চিন্তা করবোনা কেন?

৪। **শিক্ষা:** আমাদের গ্রাম্য মুরুব্বীদের কাছ থেকে আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে শিক্ষা পাওয়া মানে ৩ নম্বর চোখ পাওয়া। এই অতিরিক্ত ৩ নম্বর চোখ হবে জ্ঞানের চোখ। শিক্ষা অর্জিত হলে কোন ঘটনা ও ব্যাপারকে বুঝতে, বিশ্লেষণ করতে এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহজ হয়। আজকের দিনে যারা শিশু দু'দিন পরেই তারাই দেশ পরিচালনা করবে। সুতরাং দেশকে, জাতিকে ভালোবাসিতো দেশের জাতির কোন শিশু যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শুরু হোক শিক্ষা।

৫। **ভূমির অধিকার:** ভূমির অধিকার মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। আমি যে দেশে যে স্থানে জন্মেছি, তাই তো আমার প্রিয় পবিত্র স্থান। এরকম পবিত্র স্থানে শিশু বড় হবে এবং অন্য সব স্থান থেকে ঐ স্থানকে অধিক প্রিয় পবিত্র এবং নিরাপদ মনে হবে। জাতিসংঘ আদিবাসী অধিবেশন ২০০৯ আদিবাসী নেতারা বলেন "ভূমি-ই আদিবাসীর অস্তিত্ব এবং সংস্কৃতির পরিচয়। তাই আদিবাসীদের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে।

৬। **সংস্কৃতি:** জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ইত্যাদিতে আচার অনুষ্ঠান, নাচ, গান, সামাজিক এবং ধর্মীয় রীতি নীতি সংস্কার সাজসজ্জা অলংঙ্কার, ক্রীড়া আমোদ প্রমোদ চারুকলা কারুশিল্প প্রথা, বিশ্বাস অবিশ্বাস ইত্যাদির সমষ্টিই একটি জাতির সংস্কৃতি। আমাদের অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে নিজের স্বকীয় দিক তুলে ধরতে হবে।

৭। **সামাজিক রীতি নীতি ও ধর্ম:** অন্যান্য আদিবাসীদের মতো তঞ্চঙ্গ্যাদেরও উল্লেখযোগ্য সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে। যা বংশ পরম্পরায় শোনা ও বলার

মাধ্যমে প্রচলিত হয়ে আসছে। তঞ্চঙ্গ্যাগণ সুদূর অতীত থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা সংস্থা গঠিত হবার পর বিভিন্ন এলাকা ও অঞ্চল থেকে তঞ্চঙ্গ্যাদের জন্য একটি সাধারণ সামাজিক বিধান প্রস্তুত করার দাবী আসে। কিন্তু বিভিন্ন কারনে সংস্থা এব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারেনি। পরবর্তী প্রজন্মকে অবশ্যই তঞ্চঙ্গ্যা সাধারনের জন্য একই বিধি খাড়া করতে হবে।

৮। **ইতিহাস ও ঐতিহ্য:** দুনিয়াতে প্রতিটি জাতির উৎপত্তি এবং ধারাবাহিকতার ইতিহাস থাকে। যা সত্য এবং অপরিবর্তনীয়। তঞ্চঙ্গ্যা জাতিরও অতীত সৌর্যবীর্যের কাহিনী এবং উত্থান পতনের ইতিহাস মহাকলের গর্বে নিমজ্জিত থাকতে পারে। তাকে অতীব কষ্ট ও ধর্য সহকারে সংগ্রহ ও সংরক্ষন করতে হবে। তার সঙ্গে বর্তমান কর্মকান্ড সৃষ্ট বিষয়াদি যোগ করে সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করতে হবে। বর্তমান কর্মকান্ড হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে ইতিহাস।

৯। **সচেতনতা:** মানব জাতির ইতিহাস হচ্ছে অনিবার্যতার রাজ্য থেকে অবিরাম প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার রাজ্যে পৌঁছানোর ইতিহাস। তাই সকলকে সজাগ থাকতে হবে কখন কোথায়, কি অবস্থায় আছি এবং করনীয় কি? তা ভেবে নিতে জানতে হবে।

১০। **ঐক্য:** নিজেদের সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা/ব্যাপার অথবা আপাতত সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন ব্যাপার ভবিষ্যতে সম্পর্কিত হতে পারে সচেতন ও সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর করণীয় নির্ধারন করাতে হবে। করণীয় নির্ধারণের পর আসছে চিন্তা ও কাজের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার প্রশ্ন। নিজের জাতির স্বার্থে করনীয় প্রশ্নে যদি কোন দ্বিধা-দন্দ বা দ্বিমত থাকে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করে পরবর্তী দৃঢ় ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

১১। **স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন পূরনে সঠিক নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়া:** মহাকালের গতিধারার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতি বা ব্যাক্তি জীবনের বহুবিধ সমস্যা/বাঁধা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এবং সামনে এগিয়ে যেতে হবে এক উজ্জল ভবিষ্যতে। তাই সুষ্ঠু চিন্তাচেতনার দ্বারা সমাধানে পৌঁছার রূপরেখা আবিষ্কারের নাম স্বপ্ন দেখা। সেই সমাধানে পৌঁছার জন্য যাহাই ইতিবাচক চিন্তা ও কর্ম তাই সঠিকতা। যে ব্যক্তি/ব্যক্তিসমষ্টি ঠিক যেভাবে কর্ম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি বা তারাই সঠিক নেতৃত্ব।

*লেখক: অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, রাজস্থলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

# আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবস-২০১৫ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

জ্যোতি বিকাশ তনচংগ্যা

৯ই আগস্ট আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবস। ১৯৯৩ সাল হতে বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ-Post 2015 Agenda:Ensuring indigenous peoples'health and well-being (২০১৫ পরবর্তী কর্মসুচী ঃ আদিবাসীদের স্বাস্থ্য ও মঙ্গল সুনিশ্চিত করা) । এর মাধ্যমে আদিবাসীদের স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি। এ মৌলিক অধিকারটি জাতিসংঘ আদিবাসী দিবসের বিষয় নির্ধারণ করে বিশ্বের সব আদিবাসীদের অধিকারের কথা তুলে ধরেছে । জাতিসংঘ কর্তৃক আদিবাসী দিবস হঠাৎ করে ঘোষণা দেয়নি । এজন্য আদিবাসীদের দীর্ঘদিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। জাতিসংঘ আদিবাসীদের প্রথম স্বীকৃতি দেয় ১৯৮২ সালে । ১৯৯৩ সালকে আর্ন্তজাতিক বর্ষ ঘোষনা করে। প্রথম আদিবাসী দশক পালিত হয় ১৯৯৪-২০০৩ সাল এবং দ্বিতীয় আদিবাসী দশক পালিত হয় ২০০৫-২০১৪ সাল পর্যন্ত। সারা বিশ্বে আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে কমপক্ষে ৫০০০। এছাড়া আদিবাসী উপস্থিতি রয়েছে বিশ্বের ৭২ টি অধিক দেশে। এর মধ্যে অনেক দেশ রয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত। গ্রিনল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার ৮৫% আদিবাসী।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালন করা না হলেও বিভিন্ন এনজিও,সুশীল সমাজ এবং আদিবাসী সংগঠন দিবসটি পালন করে থাকে । বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম দিবসটি রাজধানী ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করে । সারা দেশের আদিবাসী জনগণ এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে নিজেদের আত্মপরিচয়ে পরিচিতি হবার শপথ নেয় । বাংলাদেশ সরকারের মতে বাংলাদেশে যেসব আদিবাসী বসবাস করে তারা উপজাতি,ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়। সরকার যাই উপাধি দিক না কেন বাংলাদেশে যে বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে এটি সত্য। এদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি ।

২০১০ সালে ১২ এপ্রিল রোজ সোমবার সরকারের ২৩ তম আইনের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ নামে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায়

প্রকাশিত তফসিলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও শ্রেণীর জনগণের নাম হিসেবে ২৭ টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ রয়েছে । সেগুলো হলঃ-১ । চাকমা ২ । মারমা ৩। ত্রিপুরা ৪ । ম্রো ৫ । তঞ্চঙ্গ্যা ৬ । বম ৭ । পাংখোয়া ৮ । চাক ৯ । খিয়াং ১০। খুমী ১১ । লুসাই (উসুই) ১২ । কোচ ১৩ । সাঁওতাল ১৪ । ডালু ১৫ । উসাই (উসুই) ১৬ । রাখাইন ১৭ । মনিপুরী ১৮ । গারো ১৯ । হাজং ২০ । খাসিয়া ২১। মং ২২ ।ওরাও ২৩ । বর্মন ২৪ । পাহাড়ী ২৫ । মালপাহাড়ী ২৬ । মুন্ডা ২৭ । কোল

অন্যদিকে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্যমতে বাংলাদেশে ৪৫ টি আদিবাসী / ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। দেখা যাচ্ছে আদিবাসী ফোরাম আরো ১৮ টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সরকারের তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হয়নি । তালিকায় বাদপড়া এসব জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন । যেমন সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ। সরকারি চাকুরীতে আদিবাসীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫% কোটা রয়েছে । যদিও নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয় না। বাংলাদেশ বাতায়নে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে উপজাতি জনসংখ্যা ২%। প্রধান আদিবাসী হিসেবে চাকমা, মারমা, সাওতাল, গারো, মনিপুরী, ত্রিপুরা এবং তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ রয়েছে ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন কর্মসুচী নেই। নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা থাকলেও বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন নেই। দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল যখনই বিরোধী দলে থাকে আদিবাসী দিবসে বিবৃতি প্রদান করে এবং আদিবাসীদের সম্পর্কে কথা বলে । কিন্তু যখনই কোন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে তখন বাংলাদেশে যে আদিবাসী আছে সেটিই অস্বীকার করে । নবম জাতীয় সংসদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই,অথচ তিনিই মন্ত্রী হওয়ার পূর্বে আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে আদিবাসী বন্দনায় মুখর ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে (বান্দরবান,রাঙ্গামাটি,খাগড়াছড়ি) ১৩ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। এসব জনগোষ্ঠীর রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে আসছে। নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদের আতঙ্কে থাকতে হয় সবসময়। কাপ্তাই বাধের সময় উচ্ছেদ হয়েছে অর্ধ লক্ষাধিক আদিবাসী। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে অধ্যাবধি বনায়নের নামে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি বন বিভাগ আয়ত্তে নিয়েছে। এছাড়া

পর্যটনের নামে আধিবাসীদের ভূমি দখল করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমতলের প্রভাবশালী মহলের নিকট লিজ প্রদান করে আদিবাসীদের প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (যা শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত) স্বাক্ষরিত হয় । পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা আশার বুক বেধেছিল এ চুক্তির ফলে তাদের আর উচ্ছেদ হতে হবে না নিজ বাসভূমি হতে। নিজ আত্মপরিচয় নিয়ে বসবাস করতে পারবেন। কিন্তু দীর্ঘবছর অতিবাহিত হবার পরও চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় আদিবাসীরা হতাশ। চুক্তিকে নিয়ে নতুন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজ ম্লান হতে চলেছে । তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আজ সময়ের দাবী।

আশার কথা বর্তমান দশম জাতীয় সংসদে চার জন আদিবাসী সাংসদ রয়েছেন। এর মধ্যে সরকারের দুইজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন । সাংসদ এবং মন্ত্রিগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা যায় । আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা সরকারের নিকট অবহিত করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আদিবাসীরা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে লড়াই করে যাচ্ছে। শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও আদিবাসীরা বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে এই আশায় রাষ্ট্র কখন তাদের প্রতি একটু সদয় দৃষ্টি প্রর্দশন করবে ???

* লেখক: সাবেক সম্পাদক, তৈন্‌গাঙ ।

# আদমশুমারী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

## প্বার্থ প্রতিম তঞ্চঙ্গ্যা পিয়াল

বৃক্ষ তোমার নাম কী- ফলে পরিচয়। একটি গাছের ফল দেখে যেমন আমরা ঐ গাছটি সম্পর্কে জানতে পারি, তেমনি ভাবে কোন দেশের অবস্থা কীরূপ তা আমরা ঐ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেখে নিরূপণ করতে পারি। এখন এই আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণ করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের ঐ দেশের জনসংখ্যার সামগ্রিক অবস্থা জানা প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন থেকেই আদমশুমারীর উৎপত্তি। আদমশুমারীর ইংরেজি প্রতিশব্দ census. এটি ল্যাটিন শব্দ censere হতে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে কোন কিছু ধারনা বা অনুমান করা। মূলত কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যা অনুমান বা ধারনা করতে পারার পদ্ধতিই হল আদমশুমারী। ধারনা করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮০০ সালে অর্থাৎ প্রায় ৬০০০ বছর পূর্বে ব্যবীলনদের দ্বারা প্রথম আদমশুমারী সংগঠিত হয়েছিল। ইতিহাস থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তখন প্রায় ৬ থেকে ৭ বছর অন্তর অন্তর এই আদমশুমারী করা হত। তখন মানুষের জনসংখ্যা এবং তাদের জীবন ধারনের জন্য কী কী পরিমান পণ্য মজুদ আছে তারও হিসেব করা হত।

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে প্রাচীন আদমশুমারীর নথিপত্র হিসেবে বিবেচিত চীনের Han Dynasty এর আমলের নথিপত্র। এই আদমশুমারীটি গৃহীত হয়েছিল ২A.D. সময়ে। অর্থাৎ যীশু খ্রিষ্ট মারা যাওয়ার প্রায় ২ বছর পর। এবং এটিকে ইতিহাসের অন্যতম সঠিক ও প্রাচীন আদমশুমারী হিসেবে স্বীকৃত দেয়া হয়। সে সময়ের গণনাতে চীনের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ। যা তখনকার সময়ে চীনকে বিশ্বের সর্ব্বোচ জনসংখ্যার দেশে হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তার পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন কাল হতে সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে বিশ্বের কাছে সমাদৃত ছিল। সে সময়ে বিভিন্ন রাজা বাদশার আমলে জন গননা হলেও আধুনিক পদ্ধতিতে আদমশুমারী হয় বৃটিশদের আমল থেকেই। সেই হিসেব মতে ১৮৭১ সালেই প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়। এবং প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর তা হতে থাকে।

স্বাধীন ভারতে প্রথম আদমশুমারী হয় ১৯৫১ সালে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে প্রথম আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়। এবং ২য় আদমশুমারী অনুষ্ঠিত ১৯৮১ সালে। এরপর থেকে প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর বাংলাদেশে আদমশুমারী হয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট ৫টি আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়। আমি ২০১১ সালের আদমশুমারীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের অবস্থান নিয়ে কিছু বিষয়ে অবতারণা করছি।

## আদমশুমারী রিপোর্ট-২০১১
## বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

### রাঙ্গামাটি জেলা (চার্ট-১)

| আদিবাসী ঘর সংখ্যা | চাকমা | মারমা | তঞ্চঙ্গ্যা | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|
| ৭৭,৩৫৬ | ২,৬০,৪৪৫ | ৫১,২৩৫ | ২৭,০৫২ | ১৭,৪২১ |

| মোট জনসংখ্যা | মুসলিম | হিন্দু | খ্রিষ্টান | বৌদ্ধ | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫,৯৫,৯৭৯ | ২,০৯,৪৬৫ | ৩০,২৪৪ | ৮৬৬৩ | ৩,৪৭,০৩৮ | ৫৬৯ |

### বান্দরবান জেলা (চার্ট-২)

| আদিবাসী ঘর সংখ্যা | মারমা | ম্রো | ত্রিপুরা | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|
| ৩৬,৬৭৬ | ৭৭,৪৭৭ | ৩৮,০২১ | ২০,৬৮৫ | ৩৬,২১৮ |

| মোট জনসংখ্যা | মুসলিম | হিন্দু | খ্রিষ্টান | বৌদ্ধ | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩,৮৮,৩৩৫ | ১,৯৭,০৮৭ | ১৩,১৩৭ | ৩৯,৩৩৩ | ১,২৩,০৫২ | ১৫,৭২৬ |

### খাগড়াছড়ি জেলা (চার্ট-৩)

| আদিবাসী ঘরসংখ্যা | চাকমা | ত্রিপুরা | মারমা | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|
| ৭০,৪৬০ | ১,৬১,৯৬০ | ৮৬,১৯৬ | ৬৭,০১১ | ১৮২০ |

| মোট জনসংখ্যা | মুসলিম | হিন্দু | খ্রিষ্টান | বৌদ্ধ | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬,১৩,৯১৭ | ২,৭৪,২৫৮ | ১,০৩,১৯৫ | ৪,০৭০ | ২,৩১,৩০৯ | ১০৮৫ |

ঢাকা জেলা (চার্ট-৪)

| আদিবাসী পরিবার | গারো | চাকমা | মারমা | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৯৬৯ | ৭৬৭৬ | ৫৩৭১ | ১০১৯ | ৬০৫৭ | ২০,১২৩ |

| মোট | মুসলিম | হিন্দু | খ্রিষ্টান | বৌদ্ধ | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১,২০,৪৩,৯৭৭ | ১,১৪,০০,০৯৬ | ৫,৬৬,৩৬৮ | ৬২,০৬৪ | ১৩,২৬৭ | ২১৮২ |

চার্ট-৫

| জেলা | আয়তন(বর্গ কি.মি.) | মোট উপজেলা | মোট জনসংখ্যা | আদিবাসী জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| রাঙ্গামাটি | ৬,১১৬.১১ | ১০ | ৫,৯৫,৯৭৯ | ৩,৫৬,১৫৩ |
| বান্দরবান | ৪,৪৭৯.০১ | ৭ | ৩,৮৮,৩৩৫ | ১,৭২,৪০১ |
| খাগড়াছড়ি | ২,৭৪৯.১৬ | ৮ | ৬,১৩,৯১৭ | ৩,১৬,৯৮৭ |

চার্ট-৬

| ৩ পার্বত্য জেলায় মোট জনসংখ্যা | ১৫,৯৮,২৩১ |
|---|---|
| ৩ পার্বত্য জেলায় আদিবাসীর সংখ্যা | ৮,৪৫,৫৪১ |
| ৩ পার্বত্য জেলায় অ-আদিবাসীর সংখ্যা | ৭,৫২,৬৯০ |

* ৩ পার্বত্য জেলায় অ-আদিবাসী ও আদিবাসী জনসংখ্যার অনুপাত =
৭,৫২,৬৯০:৮,৪৫,৫৪১
= ৪৮:৫২

**রিপোর্ট প্রকাশে কিছু ত্রুটি:**

বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো তাদের প্রাথমিক রিপোর্টে ৩ পার্বত্য জেলার মোট জনসংখ্যা উল্লেখ করে প্রায় ১৫,৯৮,২৩১ জন। পরবর্তীতে সংশোধনী রিপোর্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬,৬৩,২৭৪। কিন্তু ধর্ম ভিত্তিতে ও সম্প্রদায় ভিত্তিতে প্রকাশিত রির্পোটে আগের জনসংখ্যার অনুপাতেই প্রকাশ করা হয়। সেটি আর সংশোধন করা হয়নি।

জেলা ভিত্তিক প্রকাশিত রির্পোটে সম্প্রদায় ভিত্তিক যে সংখ্যা প্রকাশিত হয় তাতে মুষ্টিমেয় কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক সংখ্যা প্রকাশিত হলেও কোন আদিবাসী সম্প্রদায় কত সংখ্যক রয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে নিরূপন করা সম্ভব হয়নি।

আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে আদমশুমারী আরো নির্ভুল ও সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে সাজানো থাকবে। যার মাধ্যমে আমরা অতি সহজেই বাংলাদেশে অবস্থিত সকল আদিবাসী কোন অঞ্চলে কী পরিমানে রয়েছে তার সঠিক তথ্য জানতে পারব। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত আদিবাসী সমাজ তাদের নিজস্ব অগ্রগতি সম্পর্কে খুব সহজেই ধারণা লাভ করতে পারবে। নিজেদের উন্নয়ন সাধনে গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারবে।

*লেখক: ছাত্র, ৩য় বর্ষ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

# আদিবাসী নারীঃ সংগ্রামের এক মূর্ত প্রতীক

উজ্জ্বল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

আজ ৯ আগষ্ট, বিশ্ব আদিবাসী দিবস। আদিবাসী দিবসে আজ আমি বলতে এসেছি আমাদের আদিবাসী নারী সমাজের কথা। আমি বলতে এসেছি সেইসব নারীদের কথা যারা শত প্রতিকূলতা, শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমাদের আদিবাসী সমাজে যুগের পর যুগ কালের পর কাল আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সামাজিক রীতিনীতিকে এখনও লালন করছে, এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। ইতিহাসের সেই বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঠিক কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের আদিবাসী নারীরা? পুরুষরা কি আসলেই তাঁদের সঠিক সঙ্গটা দিতে পেরেছে নাকি তাঁরা ব্যর্থ? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই যেন আজ কলম হাতে নেওয়া। বিশদ আলোচনায় আমি ঐতিহাসিক কোন তথ্য, তত্ত্ব কিংবা কোন পরিসংখ্যানের দিকে যাবোনা শুধু আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক থেকে জাগ্রত উল্লেখিত বিষয়ের উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা আমি এখানে লিখব। প্রথমেই বলে রাখি, এটা সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা থেকে লেখা। কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমনের উদ্দেশ্যে লেখা নয়।

**১। শিক্ষাঃ**

কোন এককালে তৎকালীন ফ্রান্সের অধিনায়ক নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট নাকি বলেছিলেন-"Give me an educated mother, I will give you an educated nation" অর্থাৎ আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দিব।

এটা সত্যি একটা জাতির উন্নয়নে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। নারীকে বলা হয় জাতির ধারক ও বাহক। একটা প্রজন্ম থেকে আরেকটা প্রজন্মের শুরু হয় নারীর হাত ধরেই। সেই নারী যদি হয় শিক্ষার আলোয় আলোকিত তবে সেটা সোনার কাঠি, রূপোর কাঠির কল্পকাহিনীকেও হার মানাবে নিশ্চিত।

স্বাধীনতার পরবর্তী আমাদের আদিবাসী নারী সমাজে শিক্ষার প্রসার ঠিক যতটুকু হারে হওয়া উচিত ছিল সেটা হয়নি। এখনও অনেক আদিবাসী পরিবারে মেয়ের বদলে ছেলেকে পড়ানোর উৎসাহের দেখা মিলে। যদিও আমরা আদিবাসীরা মেয়েদেরকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি বলে মুখে ফেনা তুলি কিন্তু বাস্তব জীবনে ঠিক

কতটুকু তাদেরকে সম্মান করি আমরা? সম্মানের নমুনা যদি এই হয়- হ্যাঁ তোমার আজ থেকে পড়ার দরকার নেই, এত পড়ে কী হবে কিংবা বাড়ির সব কাজ করার পরেও, এমনকি পরিবারের ফুট ফরমায়েশ খাটার পরেও যদি তাঁদেরকে খোটা দেওয়া হয় তাহলে সম্মানের প্রশ্নটা কিন্তু বড়ই কনফিউজিং হয়ে যায়। সে যাই হোক, শিক্ষায় ঝড়ে পড়ার হার এখনও ছেলেদের চাইতে মেয়েদের বেশী...কেন? যে নারী মূল চালিকাশক্তি কিংবা প্রাণকেন্দ্র আমাদের আদিবাসী পরিবারগুলোতে তাঁকে কেন আমরা অন্ধকারে রাখছি? নাকি পৌরুষত্বের আধিপত্যভাব আমাদের মাঝেও এসে গেছে। অনেক পরিবার এখনও নারী সন্তানে খুশি নয়। কেন নয়? ছেলে চাকরি করে আপনার ভরনপোষণ করবে কিন্তু মেয়ে করবেনা সেই ভয়ে? তাহলে বলতে হয়, আধুনিক যুগে এসেও আপনি আপনারা এখনও অন্ধকারে পড়ে আছেন। আপনার সন্তান সে ছেলে হোক কিংবা মেয়ে তাঁকে যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন তাহলে আপনিতো উপকৃত হবেনই সেই সাথে জাতির উন্নয়নেও আপনি পরোক্ষভাবে অবদান রাখলেন। কারণ, একদিন ঐ মেয়েই মা হবে- সন্তানকে সুমানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্বটা তাঁর উপরেই বেশী পড়বে। সে দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করতে শিক্ষার গুরুত্বটা যে সবচাইতে বেশী দরকার মেয়েদের। আর সেই মেয়েদেরকেই কেন যেন আমরা শিক্ষা বঞ্চিত করি বেশী পড়ার দরকার নেই অজুহাত দেখিয়ে।

আদিবাসী নারী শিক্ষার হার কেন আগায়নি সে প্রশ্নে যতটুকুনা দারিদ্রতা, অশিক্ষা জড়িত তাঁর চাইতে বেশী জড়িত ছিল মানুষের অসচেতনতা এবং তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষার মান উন্নয়নের অনগ্রসরতা। এই যুগে যদিও সে অবস্থান থেকে নারীরা বের হওয়ার চেষ্টা করে দেশের বিভিন্ন ভার্সিটি এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ছে তথাপি মানুষের সচেতনতার এবং স্বদিচ্ছার অভাবটা যেন বড্ড বেশী চোখে পড়ে যখন দেখি ভুল পথে পা বাড়িয়ে অনেক মেয়েই অকালে হারিয়ে যাচ্ছে, অনেকে আবার বাল্যবিবাহের করাল গ্রাসে সাংসারিক জীবনটাকে বেছে নিয়ে নিজের সীমাবদ্ধতাকে যেন আরো বাড়িয়ে তুলছে। শিক্ষাই যে আমাদের মুক্তির প্রধান হাতিয়ার সেটা যেমন বুঝতে হবে নারীদের তেমনি বুঝতে হবে পরিবারের কর্তাদেরও। তাঁদের উচিত ছেলেটার পাশাপাশি মেয়েটাকেও সমান সুযোগ দেওয়া। জানি, দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা এখানে প্রধান বাঁধা তারপরও সদিচ্ছা থাকলে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব যেটা অনেক আদিবাসী সংগ্রামীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিও।

২। সামাজিক অবস্থানঃ

সামাজিক অবস্থানে আদিবাসী নারীদের অবস্থান এখনো তথাকথিত সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মতই। যদিও নারীরাই আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রমী তথাপি পরিবারে তাঁদের অবস্থান থাকা না থাকার মত। পরিবারের কিংবা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুতে তাঁদের মতামতের ধার ধারেন এমন পুরুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে। গ্রাম্য আদিবাসী সমাজে নারী মেম্বার, নারী চেয়ারম্যান, নারী নেতৃত্ব থাকলেও তারাও যেন সেই চিরাচরিত শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননা। সামাজিক অবস্থানে আদিবাসী নারীরা জন প্রতিনিধি, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, ব্যাংকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করলেও তাঁদের অবস্থান যেন এখনো সেই মান্ধাতা আমলেই পড়ে আছে। এখনও আদিবাসী নারীকে আমরা কেবল গৃহিণীরূপে দেখতে চাই। বাড়ি কিংবা সামাজিক কোন ক্ষেত্রে নারীদের নাক গলানোর ক্ষমতা এখনও যেন অনেকটা সীমাবদ্ধ।

৩। রাজনৈতিক অবস্থানঃ

আদিবাসী নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান একেবারেই নাজুক। নাজুক বলছি এই কারনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসী নারী সংগঠন থাকলেও তাঁদের কার্যক্রম স্তিমিত। এখনও আদিবাসী নারীরা রাজনৈতিক কোন উচ্চপর্যায়ে যেতে পারেনি। নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা যে নেই তা বলবনা বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ দিনকে দিন কমার কারণে রাজনৈতিক অবস্থানে নারীরা এখনো শক্ত কোন ভিত্তি তৈরি করতে পারেনি। পুরুষদের এক্ষেত্রে দোষ দেওয়াটাও হয়তোবা যুক্তিসংগত। কারণ তারা এ ব্যাপারে নারীদের উৎসাহ দিতে পারেনি। কিছু কিছু নারী উঠে আসলেও পুরুষদের আধিপত্যবাদী মনোভাবের কারনে এবং পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবে অনেক নারীই পরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে।

৪। পারিবারিক অবস্থানঃ

একসময় আদিবাসী পরিবারগুলোতে নারীদের একটু বয়স হলেই বিয়ে দেওয়াটা একটা সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছিল। তৎকালীন পরিবারগুলো নারীদেরকে তৈরি করতই মূলত পরের পরিবারে গিয়েও তাদের মেয়ে যেন অনায়াসে বাড়ির কাজ হতে শুরু করে জুমের কাজগুলো করতে পারে। তৎকালীন পরিবারগুলোতে ধারনা ছিল- মেয়েদের জন্যই হয়েছে কেবল রান্না করা, জুম চাষ করা এবং সন্তান উৎপাদন ও লালন পালন করার জন্য। মেয়েদের তখন পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ ছিলনা বললেই চলে। কেউ মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করতনা-

তোমার কী মতামত। অবশ্য মাতৃপ্রধান আদিবাসী পরিবারগুলোতে ব্যাপারটার একটু ভিন্নতা থাকলেও বেশীরভাগ আদিবাসী পরিবারগুলোতে মেয়েদের অবস্থান ছিল কেবল হুকুম তামিলের স্বরূপ একপ্রকার দাসী যেখানে মেয়েদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতনা কিংবা জানানোর সুযোগ দেওয়া হতনা। সেই আদি ধারণা থেকে বের হয়ে বর্তমান আদিবাসী পরিবারগুলোতে বিশেষ করে শিক্ষিত পরিবারগুলোতে এখন নারীদের সিদ্ধান্তগুলো সম্মান জানানো হচ্ছে। বাড়ির অধিকর্তা পুরুষরা পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোতে মেয়েদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিচ্ছে। তবুও সেসব পরিবারের সংখ্যাও যেন হাতেগোনা। পিতৃপ্রধান আদিবাসী পরিবারগুলো এখনো বুঝতে শিখেনি যে, নারীদেরও কিছু বলার আছে। আবার, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটাও সত্যি অনেকে পরিবার কন্যা সন্তানের আশা করলেও কন্যা সন্তানটিকে তাঁরা গড়ে তুলছেন আধুনিকতার নামে একধরনের বিকৃত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে যা আমাদের মেয়েদের তথাকথিত আধুনিকা হিসেবে গড়ে তুলছে হয়তোবা কিন্তু পরিণামে আমরা হারাচ্ছি আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা, নিজস্ব আচার এবং রীতিনীতিগুলো। অনেক পরিবারই মনে করেন, ছেলেটি কিংবা মেয়েটি বুঝি শুদ্ধ বাংলা কিংবা ইংরেজিতে অনর্গল বলতে পারলে কিংবা মডার্ন মডার্ন ড্রেস পড়লে বুঝি তাঁরা শিক্ষিত হবে, আধুনিক হবে। আধুনিকতার সংজ্ঞাটা আমাদের পরিবারগুলো এখনো ধরতে পারেনি বিধায় সেইসব পরিবারে ছেলে-মেয়েরা সর্বপ্রকার স্বাধীনতা পেলেও মূলত আমরা এমন একটা প্রজন্ম তৈরি করছি যেখানে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের কৃষ্টিকে একসময় তাঁদের কাছে খ্যাত হিসেবে মনে হবে এবং সেটা খুব সম্ভবত হয়েছেও বটে। পরিবারগুলোর উচিত হবে এক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকাকে আরেকটু ত্বরান্বিত করা যাতে তারা তাঁদের সন্তানকে নিজের মত করে এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে গড়ে তুলতে পারে এবং সঠিক শিক্ষাটা দিতে পারে ও নিতে পারে। পাশাপাশি পুরুষদেরও উচিত এক্ষেত্রে নারী সঙ্গিনীকে সর্বোপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা যাতে আমরা এমন একটা পারিবারিক আবহ তৈরি করতে পারি যেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সর্বপ্রকার অংশগ্রহণ থাকবে।

**৫। সম্পত্তিতে আদিবাসী নারীদের অধিকারঃ**

আদিবাসী সমাজের সামাজিক আইনানুযায়ী বাবা-মার সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার আছে। তবে এটির প্রয়োগও খুব একটা নেই বললেই চলে। প্রয়োগে সমস্যা আছে বললে ভুল হবে বরং মেয়েরা এক্ষেত্রে সম্পত্তির দাবি করেনা বিধায় বাবা-মার সম্পত্তি মেয়েরা খুব একটা পাননা। পেলেও সেটা যদি বাবা-মা দেন তারপরে তারা পান। আর দাবি না করলেতো পুরোটাই ভোগ করেন পুত্র

সন্তানেরা। অবশ্য বাবা-মার সম্পত্তি নিয়ে মেয়েদের খুব একটা চিন্তিত না হওয়ার কারন এটাও হতে পারে বিয়ের পর স্বামীর সংসারই তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠে। আমাদের আদিবাসী নারীদের সারল্যতা এতই বেশী তাঁরা তাদের সম্পত্তির অধিকার চাননা বললেই চলে কিংবা অনেকে এটা অজ্ঞাত যে সম্পত্তিতে তাদেরও ভাগ আছে। অবশ্য পারিবারিক সম্পত্তির অবস্থা বিবেচনা করেও অনেকে এটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননা। পুরুষেরাও নারীদের এই সারল্যতার সুযোগে সম্পত্তির ভাগ থেকে তাঁদের বোনদেরকে বঞ্চিত করতে দ্বিধাবোধ করেননা। তবে এটা সত্যি আমাদের আদিবাসী পরিবারগুলোর বেশীরভাগ অবস্থাই হচ্ছে অনেকটা দিনে আনে দিনে খাই এর মত। সম্পত্তির ভাগাভাগিতে তাঁদের অবস্থা যে আরো করুন হবে সেটাও বলার অপেক্ষা রাখেনা। মেয়েরাতো তাও বিয়ের পর স্বামীর ভরনপোষণ লাভ করেন কিন্তু পুরুষদের একদিকে যেমন নিজের স্ত্রী-সন্তানের ভরনপোষণ করতে হয় তেমনি বাবা-মার ভরনপোষণও মূলত তাঁদের কাঁধেই উঠে। অবশ্য তৎকালীন আদিবাসী মহাজনদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে মেয়েদের বিবেচনাই করা হতনা। অবশ্য পুত্র সন্তানহীন কন্যা সন্তানের জনকের ক্ষেত্রে মেয়েরাই সম্পত্তির অধিকারী হতেন। বর্তমান সময়েও যে এই পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তেমনটা না। বরং যুগ যুগ ধরে চলে আসা রীতি-পুত্রই একচেটিয়াভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ধারনাটাই এখনো চলে আসছে।

### ৬। সাংস্কৃতিক অবস্থানঃ

সাংস্কৃতিক অবস্থানে আদিবাসী নারীদের অবস্থান খুবই দৃঢ় বলতে হয়। মূলত এখনও নারীদের কারনেই আমাদের সংস্কৃতি অনেকাংশে জীবিত। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণ সত্যিই চোখে পড়ার মত। তাঁরা দেশ বিদেশে আমাদের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে। এই একটা ক্ষেত্রেই বোধহয় পরিবার থেকে খুব একটা বাঁধা আসেনা যার জন্য এক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের অগ্রগতি অনেক দ্রুততর হয়েছে।আদিবাসী পুরুষরাও নারীদের এক্ষেত্রে যোগ্য সঙ্গটাও দিতে পেরেছে বোধ করি। তবে বর্তমানে মিশ্র সংস্কৃতির যে চর্চা শুরু হয়েছে ভয় হয় সেটাতে গা ভাসিয়ে আমরা না আমাদের মূল সংস্কৃতিটাই হারিয়ে ফেলি। বিভিন্ন আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে নিজেদের স্বকীয় সংস্কৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের প্রজন্মটা হিন্দি, ইংরেজির দিকে ঝুঁকুক তবে যেন গা না ভাসাক। নিজেদের সংস্কৃতির দিকেও যেন তাঁরা নজর দিক এবং চর্চা করুক। আমাদের সংস্কৃতির আধুনিকায়নে নতুন

প্রজন্মকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে এটা যতদিননা আমরা বুঝবনা ততদিন সংস্কৃতির উন্নয়ন সম্ভব নয় বলেই মনে করি।

সর্বোপরি, এটাই পরিলক্ষিত হয় আমাদের আদিবাসী নারীরা শুধুমাত্র জুম চাষ এবং গৃহী কাজের গন্ডি থেকে বের হয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সফলতার সাথে এগিয়ে চলছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে পুরুষদের সহযোগিতার ফলেই। যদিও আদিবাসী পুরুষরা নারীদের এখনও যথাযথ সহযোগিতা করছেন না তথাপি নারীদের দৃঢ়তা, একাগ্রতা এবং পরিশ্রমের জোরে তারা ভালোই এগিয়ে চলছেন তাঁদের লক্ষ্যপথে। আমাদের আদিবাসী পুরুষগন যদিও গর্ব করেন এই বলে যে, আদিবাসী নারীরা আদিবাসী পুরুষদের হাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং পুরুষরা নারীদের যথাযথ সম্মান করেন। আমি জানিনা এই গর্বটা ঠিক কতটুকু সত্যি। সহনশীলতায় আমাদের আদিবাসী নারীদের তুলনা হয়না বললেই হয়তোবা পুরুষদের একগুঁয়েমিতা আমাদের সমাজে খুব একটা চোখে পড়েনা। আমাদের সামাজিক বিচার ব্যবস্থার কারনেও হয়তোবা এগুলি খুব একটা প্রকাশ্যে আসেনা। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলি আদিবাসী নারীরা আজ স্বয়ং তাঁদের জাত ভাইদের হাতেও নিরাপদ নয়। আমি জানি অনেকের আঁতে ঘা লাগছে কথাগুলি শুনে। কিন্তু আড়ালে আবডালে আমাদের আদিবাসী নারীদের দমিয়ে রাখছে কিন্তু আমাদের পুরুষরাই। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের আদিবাসী পুরুষরা এমন একটা পরিবেশে বড় হচ্ছে যারা আজকাল খুব তাড়াতাড়িই এমন কিছু অসামাজিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে যা আদিবাসীদের সামাজিকতার যে সুনামটা ছিল সেটা অনেকটা ঢিলে হয়ে গেছে বলেই মনে করি। আমাদের সমাজে ধর্ষণ নেই বলে যারা বড়াই করেন তাঁরা শুনে রাখুন আশেপাশে চেয়ে দেখুন কত ধর্ষণ হচ্ছে এবং সেই ধর্ষকদের হাতেই আমরা ধর্ষিতাকে তুলে দিচ্ছি ধুমধাম করে বিয়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এমন একটা সামাজিক রীতিও ছিল একসময়, যদি কোন আদিবাসী নারী একজন আদিবাসী পুরুষ দ্বারা প্রেগন্যান্ট হত বিবাহের আগে তবে পুরুষটাকে কেবলমাত্র শুকর দেওয়ার বিনিময়ে এবং কিছু জরিমানার বদৌলতে দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হত কিংবা ছেলেটার মেয়েটাকে বিয়ে করতে হত। তবে ক্ষমতাশালী গ্রাম্য মোড়লদের হাত করে অনেকেই এসব অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়ে যেত। অনেক সময়তো আবার উল্টো মেয়েটাকেই দোষারোপ করা হত। নারীদের যথাযথ সম্মান কোন পুরুষ সমাজ কখনো কোনদিন দেয়নি এটা মনে রাখুন। এতদসত্ত্বেও, নারীরা সংগ্রাম করছে; এ সংগ্রাম নারীত্বের, এ সংগ্রাম টিকে থাকার, এ সংগ্রাম সকল বঞ্চনা এবং লাঞ্ছনার অবসানের।

সর্বশেষ, আমাদের আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থা থেকে কিছুটা লিবারেল হলেও আমাদের সমাজটাও যে কিছুটা পচে গেছে সেটার দায় যেমন আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর বর্তায় তেমনি বর্তায় আদিবাসী শিক্ষিত সমাজের উপর যারা সমাজটাকে আরো সুন্দর করে তুলতে পারেননি। এর দায় বর্তায় আমাদের পরিবারগুলোর উপর যারা সামাজিক এবং পারিবারিক বন্ধনটাকে দৃঢ় করতে পারেননি এবং সন্তানদেরকে সুষ্ঠু শিক্ষাটা দিতে পারেননি।

আমি আজ সম্মান জানাই, স্যালুট করি সেইসব আদিবাসী নারীদের যারা শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সংগ্রাম করছেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিবারের মুখে হাসি ফুটাচ্ছেন, সন্তানকে বড় মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে নিজের চাইতে ভারী ওজনের ভার বহন করে রক্তকে পানি করছেন। সেইসাথে স্যালুট জানাই সেইসব আদিবাসী পুরুষদের যারা নারীকে তাঁদের শক্ত হাতটি বাড়িয়ে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। ভালো থাকুক আমাদের আদিবাসী নারীরা...ভালো থাকুক আমাদের আদিবাসী সমাজ...মুক্তি পাক শাসকদের শোষণ থেকে। আদিবাসী দিবস হোক আদিবাসীদের একসূত্রে গেঁথে শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দিন হিসেবে। কেবল মুখে পাউডার লাগিয়ে নাচ গান করে, কিছু ভোলপাল্টানো বুদ্ধিজীবিদের বক্তৃতা শুনিয়ে যেন দিনটিকে পালন করা নাহয়...ধন্যবাদ।।

*লেখক: ছাত্র, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ।

# আদিবাসী জুম্ম প্রতিবাদী নারী "কল্পনা চাকমা"

## শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা (দেবশ্রী)

কল্পনা চাকমা ছিলেন একজন আদিবাসী জুম্ম প্রতিবাদী নারী এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। কল্পনা চাকমা অপহরণের পর সময় অনেক অতিবাহিত হয়ে গেছে। এবং অপহরণের পর বাংলাদেশের অনেকগুলো মানবাধিকার সংগঠন ও নারী সংগঠন কল্পনা চাকমার অপহরণের বিচার চেয়ে নানাবিধ তৎপরতার জন্ম দিয়েছিল এবং এখনও কদাচিৎ তা নিয়ে আন্দোলন চলমান। কিন্তু এত তৎপরতার পরও আমরা আদিবাসীরা কি এর বিচার পেয়েছি, পাই নাই। কল্পনা চাকমার মতো হাজারো কল্পনা চাকমা আজ অপহরণ হচ্ছে, খুন হচ্ছে, গুম হচ্ছে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আর এই সব বিচারও রাষ্ট্রযন্ত্রের ছোবলে, সাম্প্রদায়িকতায় কল্পনা চাকমার বিচার এর মত কালের গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই কল্পনা চাকমা হচ্ছে হাজারো আদিবাসী নারীর নির্যাতনেই বিমূর্ত মূর্তি এবং যিনি ছিলেন হাজারো অসহায় নারীর অগ্রদূত।

১৯৯৬ সালের জুন মাসের ১২তারিখ দিবাগত রাত ১.৩০ হতে ২.০০ টার মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলাধিন বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউলাল্যঘোনা নিজ বাড়ী ফেরার পথে কল্পনা চাকমাকে সেনাবাহিনী কর্মকর্তা লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে একদল সেনা ও ভিডিপি সদস্য কর্তৃক নির্মমভাবে অপহরণ করা হয়। এসময় পিতৃহীন কল্পনার দুই বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা (কালীচরণ) ও লালবিহারী চাকমা (ক্ষুদিরাম) কেও বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা গুলির মুখে পালিয়ে কোনমতে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য যে, কল্পনা চাকমার বড় ভাই লালবিহারী চাকমা স্পষ্টতই টর্চের আলোতে অপহরণকারীদের মধ্য তাদের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী বাঘাইছড়ি সেনাক্যাম্পের কমান্ডার লেঃ ফেরদৌস (সম্পূর্ণ নাম মোঃ ফেরদৌস কায়ছার খান) এবং তার পার্শে দাঁড়ানো ভিডিপি প্লাটুন কমান্ডার মোঃ নুরুল হক ও মোঃ ছালেহ আহম্মদ কে চিনতে পারেন।

১৯৯৬ সালের ১৩ই জুন ভোর হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র কল্পনার খোঁজখবর নিয়েও কোন হদিস না পাওয়ায় কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান দিপ্তীমান চাকমাকে নিয়ে বাঘাইছড়ির ইউএনওর নিকট বিষয়টি অবহিত করেন। বাঘাইছড়ি ইউএনওর কাছে বর্ণিত বিবরণই বাঘাইছড়ি থানার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে একটি অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং থানায় তা মামলা নং ২, তারিখ ১৩/০৬/৯৬ ধারা ৩৬৪ দঃ বিঃ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর পর ১৭ জানুয়ারি ১৯৯৭ইং তারিখে মামলাটি জেলা গোয়েন্দা শাখা, রাঙ্গামাটি নিকট হস্তান্তর করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখ হতে মামলার তদন্ত কার্যক্রম পুনরায় বাঘাইছড়ি থানায় স্থানান্তর করা হয়। মামলা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৫৭জন কর্মকর্তার হাতে ঘুরেছে এই মামলা। অপহরণ ঘটনার প্রায় ১৪ বৎসর পর ২০১০ সালের ২১শে মে ঘটনার বিষয়ে পুলিশের চুরান্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। যাতে অভিযুক্ত ও প্রকৃত দোষীদের সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়ার ফলে বাদী কালিন্দী কুমার চাকমা আদালতের উক্ত চুড়ান্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদন করেন। এরপর ২রা সেপ্টেম্বর ২০১০ ইং আদালত দাখিল হত নারাজির উপর শুনানী শেষে মামলার বিষয়ে অংকিত তদন্তের জন্য পুনরায় সিআইডি পুলিশকে নির্দেশ দেন। এর দুই বছর পর গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১২ জনৈক তদন্ত কর্মকর্তা কতৃক চট্টগ্রাম জোন সিআইডির পক্ষ থেকে চুড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়। উক্ত সিআইডি তদন্ত রিপোর্টেও কল্পনার কোন হদিশ না পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হলে বাদী কালিন্দী কুমার চাকমা আবার ও উক্ত সিআইডি তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখান করেন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান। পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উক্ত সিআইডি তদন্ত রিপোর্ট বাতিল এবং নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য পুনঃ তদন্ত সহ ন্যায় বিচারের দাবি জানান।

সর্বশেষ গত ২০শে জুলাই ২০১৪ইং রাঙ্গামাটির তৎকালীন পুলিশ সুপার আমেনা বেগম কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার উপর রাঙ্গামাটির চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তদন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করেন, গত ২৭শে মে ২০১৫ইং অনুষ্ঠিত উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর শুনানিতে আদালত আবার গত ১৬ই জুন ২০১৫ইং শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেন। এভাবে শুনানির পর শুনানি চলছে কিন্তু এখনো তদন্তের বা বিচারের অগ্রগতি নেই। গভীর উদ্বেগ ও পরিতাপের বিষয় যে, অপহরণের ১৯ বছরেও বাংলাদেশ সরকার বা প্রশাসন অপহৃত কল্পনা চাকমার কোন হদিস দিতে পারেনি এবং অভিযুক্ত চিহ্নিত অপহরণকারীকে গ্রেফতার করেনি বা ওই অপহরণ ঘটনা যথাযথ বিচার নিশ্চিত করতে পারেনি। বলা বাহুল্য স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী নীতির কারনে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ও সেটেলার

বাঙ্গালীদের কর্তৃক এ পর্যন্ত শত শত জুম্ম নারী খুন, ধর্ষণ , অপহরণ ও নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পরও যথাযত ভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের নেতৃত্বে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ার কারণে আদিবাসী জুম্ম নারীর উপর নিপীড়ন নির্যাতন ও যৌন হয়রানি অব্যাহত ভাবে চলছে। পার্বত্য চট্টাগ্রাম চুক্তির উত্তর কালে এক হিসাবে ১৯৯৮-২০১০ সালের মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে ৫৭ জন পাহাড়ি নারী ধর্ষণের শিকার হয় এবং যৌন হয়রানির শিকার হয় অন্তত ৩১জন পাহাড়ি নারী। যেমন ২০১২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫৫ জন আদিবাসী জুম্ম নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছে।

যাদের মধ্য ১৪ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আবার আরেক হিসাবে ২০১৩ সালে ৫৩ জন নারী ও শিশু এবং ২০১৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৭১ জন জুম্ম নারী ও শিশু যৌন ও শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছে। এতে দেখা যায় জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এখন সারাবিশ্বের নারী জাতির রাজনৈতিক, অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার ও অন্যায়ের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্য জোরদার সংগ্রাম চলছে। নারী জাতি মাথা উঁচু করে উঠে দাড়াবার তথা সমাজ জীবনে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের শ্লোগান উন্নত বিশ্বের ন্যায় ধ্বনিত হচ্ছে এবং ক্রমশঃ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। নিপীড়িত, নির্যাতিত জুম্ম নারী সমাজকে পারিবারিক ও সামাজিক দাসত্ব তথা শাসক শ্রেণীর সকল প্রকার শাসন শোষণ থেকে মুক্তি লাভের সংগ্রাম পার্বত্য জুম্ম নারীকে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতে হবে। তাই মা-বোনদের প্রতি আমার জোর আহবান জানাচ্ছি, নিজেদের মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেরা এগিয়ে আসুন। পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতিকে শক্তিশালী করুন।

*আমাদের আদিবাসী জুম্ম প্রতিবাদী একজন নারী কল্পনা চাকমা হারিয়ে গেছে আমরা তার বদলে হাজারও কল্পনা চাকমা জন্ম হবো।

*পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য জুম্ম নারীর সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হতে বাধ্য। জুম্ম নারী সমাজের মর্যাদা ও

অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন করি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি।

*সকল ক্ষেত্রে জুম্ম নারীর সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

*জুম্ম নারীর উপর সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

*পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

*ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

*নারী সমাজের নিরাপত্তা ও অগ্রগতির স্বার্থে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

*আদিবাসী প্রতিবাদী জুম্ম নারী কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চাই, দিতে হবে।

পরিশেষে বলব সকল জুম্ম আদিবাসী নারী যদি এক মত হয়ে চলে এবং অধিকার ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করে তাহলে আশা করি আর আদিবাসী জুম্ম নারী পিছিয়ে থাকবে না, বরং সামনের দিকে এগোতে থাকবে।

*লেখক: ছাত্রী, দ্বাদশ শ্রেণী, বান্দরবান সরকারী মহিলা কলেজ।

# তঞ্চঙ্গ্যা জাতির কৃষ্টি ঃ আদি ও আধুনিক জীবন

চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা

ইতিহাস মতে, মোগল সম্রাট আকবর বাৎসরিক খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বছরের একটি দিন সুনির্দিষ্ট করেন। যাতে বাৎসরিক খাজনা প্রদানের জন্য সকল প্রজা মানসিক ও আর্থিকভাবে প্রস্তুত থাকতে পারে। তাঁর মন্ত্রী পরিষদ বছরের শেষ দিনকে খাজনা আদায়ের দিন হিসেবে সুনির্দিষ্ট করেন কালক্রমে যা চৈত্র সংক্রান্তি নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রজাগণ যাতে উৎসাহ ও আনন্দের সাথে খাজনা প্রদান করে, সেজন্য ঐদিন এক মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। তাঁর (সম্রাট আকবর) অধীনে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈনসহ আরো অনেক ধর্মাবলম্বী প্রজা বাস করত। তাই সকল ধর্মের ও সকল শ্রেণীর প্রজার জন্য এই চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের নানা স্থানের নানান জাতিগোষ্ঠী মহাসমারোহে চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব পালন করে আসছে।

চৈত্র সংক্রান্তি বা বিষু উৎসব দেখে অনুমিত হয় যে, পূর্বে তনচংগ্যা জাতিও সম্রাট আকবরের অধীন প্রজা ছিল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাসস্থান পরিবর্তন করলেও তারা তাদের পূর্ব সম্রাটের সৃষ্ট উৎসবের কথা আজও ভুলতে পারেনি। তঞ্চঙ্গ্যাগণ আজও জানে না, কবে থেকে তারা এই উৎসব পালন করে আসছে। প্রশ্ন করলে তারা বলে যে, পূর্বপুরুষগণ যুগ যুগ ধরে এই উৎসব পালন করে আসছে, তাই তারা আজও তা ধরে রেখেছে। সময়ের প্রেক্ষিতে বিষু বা চৈত্র সংক্রান্তি তঞ্চঙ্গ্যাদের আজ সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব।

বিষু উৎসবকে ঘিরে তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে রয়েছে নানান বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এই উৎসব পালন করে আসলেও আজ তাতে ভাটা পড়া শুরু করেছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে তঞ্চঙ্গ্যাগণ বিষু উৎসব পালন করছে নামমাত্র। উৎসবে কোন উৎসাহ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, প্রেরণা নেই। নেই নতুন বছরকে ঘিরে কোন কল্পনা-জল্পনা কিংবা পরিকল্পনা। বরঞ্চ বিষু উৎসব ঘনিয়ে আসলে তাদের মনের গভীরে এসে হানা দেয় এক অজানা অনাকাঙ্খিত আতঙ্ক, শ্রীহীন অশুভ ভবিষ্যত। কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে আসুন আমরা জেনে নিই তঞ্চঙ্গ্যাদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব বিষুর বিস্তারিত বর্ণনা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের আচরিত প্রথা ও বিশ্বাস-অবিশ্বাস সমূহ।

**ফুল বিষু ঃ** তঞ্চঙ্গ্যারা তিন দিন ধরে বিষু উৎসব পালন করেন। এই তিনটি দিনের জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র তিনটি নাম যথাক্রমে ফুল বিষু, মূল বিষু ও নয়া বছর। আমরা এখন বিষু উৎসবের প্রথম দিন ফুল বিষু সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

ফুল বিষু হল পুরাতন বছরের দ্বিতীয় শেষদিন অর্থাৎ চৈত্র মাসের ২৯ তারিখ। এই দিনকে বিষু উৎসবের চূড়ান্ত প্রস্তুতির দিনও বলা যায়।

ফুল বিষুর দিনে আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রত্যেক তঞ্চঙ্গ্যা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নানের উদ্দেশ্যে ঘাটে গমন করে। তখন তাদের হাতে থাকে দুই টুকরা কলার পাতায় এক গুচ্ছ ফুল, মোম ও আগর বাতি। তারা স্নান শেষে জলদেবী গঙ্গাকে মোম ও আগর বাতি জ্বালিয়ে পূজা করে। তাঁর কাছ থেকে পুরাতন বছরের ভুলক্রটির ক্ষমা ও নতুন বছরের মঙ্গলময় আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। অতপর নদীতে বা খালের পানিতে বা কূয়ার পানিতে ফুল ভাসিয়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। তখন ফুলে ফুলে ভরে উঠে সম্পূর্ণ ঘাট।

স্নানের পর চলে হরেক রকমের ফুল সংগ্রহের পালা। তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বা যুবক-যুবতীরা ঘুরে ঘুরে নানা জায়গা থেকে নানান পদের ফুল সংগ্রহ করে। এসব ফুল দিয়ে তারা ঘরে রক্ষিত বুদ্ধের প্রতিমূর্তি বা প্রতিচ্ছবিকে পূজা করে। পাশাপাশি ঘরে রক্ষিত ধনদেবী লক্ষ্মীর প্রতিচ্ছবিও পূজা করে থাকে।

অতপর তারা ফুল ও ফুলের মালা দিয়ে সমস্ত ঘর ফুলে ফুলে সাজিয়ে তোলে। বউ-ঝিয়েরা মাটি দিয়ে ঘর লিপে ঘরের মেঝে ঝকঝকে করে তোলে। অবশেষে তারা ঘরের সমস্ত কাপড়-চোপড় ও আসবাবপত্র ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে ফেলে। গৃহ ও গ্রামের পথ-ঘাট অতিথিদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে।

ফুল বিষুর দিনে নদী-নালা, বন-বাদাড় ঘুরে নারী-পুরুষ মিলে হরেক রকমের মাছ-মাংস ও তরি-তরকারি সংগ্রহ করে 'পাইচন' তৈরী করার জন্য। পাইচন হল এক প্রকার ঘন্ট যা ভেষজ ঔষধের মতই কাজ করে। ১২৭ প্রজাতির শাক-সবজি ও মাছ-মাংস মিশ্রিত পাইচন'ই সর্বোত্তম পাইচন হিশেবে স্বীকৃত। তাই প্রত্যেক তঞ্চঙ্গ্যা রমণী চেষ্টা করে যাতে তার তৈরীকৃত পাইচনে ১২৭ প্রজাতির শাক-সবজি ও মাছ-মাংস উপস্থিত থাকে। কারো কারো মতে তা ১২২ প্রজাতির। যদি কেউ ১২৭ প্রজাতির মাছ-মাংস ও তরি-তরকারি সংগ্রহ করতে না পারে তবে অন্তত ২২ প্রজাতির মিশ্রিত পাইচনও উত্তম পাইচন বলে বিবেচিত হয়।

ফুল বিষুর দিনে তঞ্চঙ্গ্যা পল্লী ঢেঁকির শব্দে গমগম করতে থাকে। কেউ ভানেন হরেক রকমের ধান, কেউ বা কোইন (তিসি)। কোইন দিয়ে তৈরি হয় কোইন ভাত। বিনি চাল দিয়ে তৈরী হয় বিনি ভাত, বিনি পিঠা, আলসি পিঠা; অন্যান্য চাল দিয়ে তৈরী হয় মালি পিঠা বা গুলিক পিঠা, সাইন্যা পিঠা, কলা পিঠা, তেলের পিঠা বা বড়া পিঠা প্রভৃতি। মদ তৈরীর কাজও চলে সমান তালে।

এইসব কাজে তঞ্চঙ্গ্যাগণ সারাদিন ব্যস্ত থাকে। দেখতে দেখতে রাত গভীর হয়। তবুও তঞ্চঙ্গ্যা রমণীরা উনুনের তাপে দগ্ধ হতে থাকে। পুরুষেরা তাদের সাহায্য করে।

ফুল বিষুর দিনে কেউ পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে না, শুধু চলে বিষু উৎসবের চূড়ান্ত প্রস্তুতি।

**মূল বিষু** ঃ পুরাতন বছরের শেষ দিন বা ৩০শে চৈত্র হল মূল বিষু। এই দিনের আরেক নাম কাদাকাচ্যা দিন। বিশ্বাস মতে, ফুল বিষুর দিবাগত রাতে সৃষ্টিকর্তা কুয়াশা বৃষ্টি আকারে সমগ্র পৃথিবীতে বিষ ঢেলে দেন। যার কারণে পরের দিন সমস্ত নদীনালা শস্যক্ষেত বিষাক্ত হয়ে যায়। বিষের ভয়ে কাদাকাচ্যা দিনে কেউ নদীনালা বা কূয়া থেকে খাবার পানি তোলে না, ক্ষেত থেকে কোন খাদ্য-শস্য বা তরি-তরকারি সংগ্রহও করে না। আজ এবং আগামী কালের জন্য যা যা প্রয়োজন তা ফুল বিষুর দিনেই সংগ্রহ করে রাখতে হয়।

মূল বিষু যেই বারে পড়ে, কারো জন্মবার যদি ঐ একই বারে হয় (অর্থাৎ শনিবার, রবিবার, সোমবার এই রকম) তাহলে সেই জাতকের জন্য নতুন বছরটি মঙ্গলজনক নয়। সেই বছর তার রোগ-শোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই রোগ-শোক থেকে বাঁচার জন্য তাকে সেই দিন টিটা শাকের ঝোল খেয়ে শরীরকে তেঁতো করে তুলতে হবে। পাশাপাশি বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গাছের দুটি শাখার ফাঁকে মাঝারি আকারের পাথর তুলে দিতে হয়। অথবা দুটি পথের সংযোগস্থানে মাঝারি আকারের পাথর রেখে দিতে হয়। আবার কেউ কেউ গাছ-বাঁশ দিয়ে জনপথে সাঁকো দেয়।

মূল বিষুর দিন সকালে কেউ কেউ ইতর প্রাণীদের উদ্দেশ্যে ঘুরে ঘুরে এ ঘর থেকে ও ঘরে ধান ছিটিয়ে দেয়। ছিটানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া সব ধান ছিটানোর বিধান নেই। সমস্ত ধান ছিটালেই অমঙ্গল। এক মুঠো পরিমাণ ধান হলেও ঘরে ফিরিয়ে আনতে হয়। এই ফিরিয়ে আনা ধান দিয়ে ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা বাঞ্ছনীয়। নতুবা অমঙ্গল সুনিশ্চিত।

অতপর সকলে মিলে ফুল-বাতি ও পিন্ড নিয়ে ক্যাঙের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বুদ্ধ, ভিক্ষু-শ্রামণ ও উপোসথধারীদের পূজা করে। পঞ্চশীল গ্রহণ করে এবং ভিক্ষুর নিকট থেকে ধর্মদেশনা শুনে ও মঙ্গলময় আশীর্বাদ নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। সেই সাথে চলে অতিথিদের আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ জানানোর পালা। বিকেল থেকে দলে দলে শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বিবাহিত-অবিবাহিত সকলে ঘুরতে বের হয়। তারা এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে, এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘোরে আর পানীয়, ফল ও পিঠা ভোজন করে। গৃহকর্তা-কর্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়ে অতিথি আপ্যায়নের কাজে।

শিশু-কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত কারোর প্রতি কোন বাধাধরা নেই উৎসবের এই দিনে। সবাই মুক্ত-স্বাধীন। যার যা ইচ্ছে তা খেতে পারে। শিশু-কিশোর তরুণ-তরুণী সকলে মদ-জগরা-কাঞ্জি পান করে, পিঠা খায়, রেইঙ (হলুধ্বনি) ছাড়ে, মনের সুখে উবাগীত গায়। খেয়ে মাতাল হয়, গড়িয়ে পড়ে। এই কারণে এই দিনকে অনেকে গর্জ্যাপর্জ্যা দিনও বলে। কারো কারো মতে, মূল বিষু হচ্ছে পুরাতন বছরের বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর দিন। এই জন্যও এইদিনকে গর্জ্যাপর্জ্যা দিন বলা হয়।

**নয়া বছর ঃ** নয়া বছর বা নতুন বছর হলো বিষু উৎসবের শেষ দিন। এটি পালন করা হয় পহেলা বৈশাখে। এটি মূলত নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর দিন। এদিনেও তঞ্চঙ্গ্যারা অবাধে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে, এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘোরে আর খায়। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এদিনে কেউ কেউ 'নয়া বছর' এর চুঙুলাং করে। (চুঙুলাং হলো তনচংগ্যাদের গৃহ দেবতার নাম। বিস্তারিত জানার জন্য চুঙুলাং পূজা নিবন্ধটি পড়ুন) গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই বর্ণাঢ্য আয়োজন। অতপর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সকল তঞ্চঙ্গ্যা নতুন বছরের জীবন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়। সমাপ্ত হয় স্মরণীয় একটি উৎসবের।

**আধুনিক জীবনে বিষু ঃ** তঞ্চঙ্গ্যাদের আধুনিক জীবন শুরু হয়েছে মূলত একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। তনচংগ্যাদের জন্য এই সময়টা আদিমতা, কুসংস্কার আর মিথ্যাদৃষ্টি থেকে বেরিয়ে এসে সত্যের সন্ধান করার সময়। আপন জাতির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করার নিমিত্তে, নিজেদেরকে বিশ্বের আমজনতার সামনে পরিচয় করানোর জন্য আধুনিককালের তনচংগ্যারা বিষু উৎসবের জন্য বিভিন্ন স্থানে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। এসব অনুষ্ঠানে চলে ঘিলা খেলা, নাদেং খেলা, গুদু খেলা, আলাম বোনা, তম্বুরু খেলা, জুম্ম পিঠার প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ আরো নানান আয়োজন। ঘরে ঘরে শোভা পায় সেমাই, মিষ্টি, জিলাপী, বাতাসা, মুড়ি. মিষ্টান্ন, বিভিন্ন প্রকার বিস্কুট, তরমুজ, খেজুর, কুল

প্রভৃতি। মদের পরিবর্তে পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন প্রকার কোমল পানীয় ও ফলের জুস। ধর্মপ্রাণ তঞ্চঙ্গ্যারা চুঙুলাং পূজার পরিবর্তে বাড়িতে ভিক্ষু এনে মঙ্গল সূত্র ও ধর্মদেশনা শুনছে।

তারপরও বিষু উৎসব এলেই সকলের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। শঙ্কার মধ্যে সকলে দিন গোণে, না জানি বিষু উৎসব পালন করা সম্ভব হবে কিনা? মূলত অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সাংস্কৃতিক বিবর্তন তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সবচেয়ে বড় উৎসব এই বিষুর গুরুত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

তঞ্চঙ্গ্যা নবপ্রজন্ম পুরাতন সামাজিক রীতিনীতির প্রতি কেমন যেন উদাসীন। মূল বিষুর দিনে ক্ষেত-খামার থেকে শাক-সবজি সংগ্রহ করতে কিংবা নদীনালা থেকে পানি খেতেও নবীনপ্রজন্ম কোন সংকোচ বোধ করে না, যদিও এতে বৃদ্ধরা পরম অসন্তুষ্ট। তারপরও বিষু উৎসব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে, শত্রুতা ভুলিয়ে দেয়, সকলের মধ্যে ঐক্য তৈরী করে। এজন্য বিষু আমাদের পরম উপকারী এবং আকাঙ্খিত এক স্বাপ্নিক মুহূর্ত।

*লেখক: কবি ও সাহিত্যিক।

# তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাদের সংস্কৃতি

বোধিপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ সরকারের আইন দ্বারা স্বীকৃত একটি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। ঐতিহাসিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো হতে ব্যতিক্রমধর্মী। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, পার্বত্য অঞ্চলে ১৩টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছেন এবং এক সময় তারা সকলেই বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা খুব সহজ সরল এবং সাদাসিধে জীবন যাপনে করতে অভ্যস্ত। তাদের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা এবং চাকমা দুইটি খুবই সুপরিচিত নাম। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে জানা যায় ইতি পূর্বে তঞ্চঙ্গ্যা নামে কোন জাতি ছিলেন না, তবে চাকমা/চাংমা নামেই সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন তারা। কখন থেকে তঞ্চঙ্গ্যা জাতির উৎপত্তি হয়েছে এবং কিভাবে হয়েছে তার কোন সঠিক ইতিহাস এখনো জানা যায়নি। অনেকেই ধারণা করে থাকেন তঞ্চঙ্গ্যা জাতি মূলত চাকমা জাতির একটি অঙ্গ বা একটি শাখা।

আমরা সকলেই জানি চাকমাদের আদি নিবাস চম্পকনগর আর কোথায় সেই চম্পক নগর তার খোঁজ এখনো মেলেনি, অপর দিকে তঞ্চঙ্গ্যাদের আদি নিবাস ছিল আরাকান রাজ্যে। সম্ভবত ১২ শতকের শেষের দিকে বা ১৩ শতকের শুরুতে এই মাঝমাঝি সময়ে আরাকান রাজ্যর রাজার সাথে চাকমা/চাংমা রাজার (বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যা) মধ্য যুদ্ধ সংগঠিত হয়। কী নিয়ে বা কোন বিষয় নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে এতে চাকমা/চাংমা রাজার সেনা প্রধান ধর্ম সেনাপতি সাহসী কমান্ডার ছিলেন রাধামন। তার নেতৃত্বে ছিল সকল চাকমা/চাংমা সৈনিক দল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে চাকমা/চাংমা রাজার দল পরাজিত হয়। পরাজিত হওয়ার পরপরই শুরু হয় চাকমা/চাংমাদের (বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যা) উপর নির্যাতনের পালা। আরাকান রাজ্যর রাজা চাকমা/চাংমাদের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। এতে অনেক চাকমা/চাংমা নির্যাতিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় সেই নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদেরকে অনেক দিন অনেক রাত গভীর জঙ্গলের মধ্যেও আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু এতেও শেষ হয়নি তাদের দুঃখ, শেষ রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তাই তারা

যে যেদিকে পারেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরেন। তাদের মধ্য অনেকেই পালিয়ে এসেছেন বাংলাদেশে আবার অনেকে পালিয়ে যান ভারতে।

বাংলাদেশে পালিয়ে এসে চাকমারা (বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যারা) প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন তৈন গাঙ্গ নামে একটি নদীর তীরবর্তী স্থানে। যে গাঙ্গ এর উৎপত্তি মায়ানমার এর সীমান্তবর্তী কোন এক পাহাড় থেকে এবং যার সমাপ্তি মাতামুহুরি নামক একটি নদীতে এসে। তৈন গাঙ্গ মূলত মাতামুহুরি নদীর একটি শাখা নদী। সম্ভবত সেই তৈন গাঙ্গের নামানুসারে সৃষ্টি হয় তঞ্চঙ্গ্যা জাতির নতুন ইতিহাস। তঞ্চঙ্গ্যা নামের অর্থ দাঁড়ায় "টং মানে হিল আর ঞ্চঙ্গ্যা মানে হল ঝুম", তাই তঞ্চঙ্গ্যা জাতিকে পার্বত্য swidden কৃষক বলা হয়ে থাকে।

তৈন গাঙ্গ যেহেতু বাংলাদেশে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রথম আশ্রয় স্থান তাহলে আরও কিছু জেনে নেওয়া যাক সেই তৈন গাঙ্গের ইতিহাস সম্পর্কে। তৈন গাঙ্গ এবং মাতামুহুরি নদী যে স্থানে মিলিত হয়েছে ঠিক তার একটু পূর্ব দিকেই একটি পাহাড়ের মধ্য বিরাট এক সুরঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সুরঙ্গে আগে অনেক বাদুর পাওয়া যেত আর ঐ সময়ে এলাকায় মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তাদের মধ্য তঞ্চঙ্গ্যা এবং মুরুংদের সংখ্যাই বেশি ছিলেন। সেই সময়ে মুরুংরা বাদুর শিকারের জন্য ঐ সুরঙ্গে যেতেন আর অনেক সময় তারা সেখানে এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেতেন। সম্ভবত তিনিই ছিলেন ঐ সুরঙ্গের মালিক। আবার অনেকেই বলে থাকেন ঐ সুরঙ্গের মালিকের নামানুসারে নাকি জায়গাটির নাম হয়ে উঠে আলীকদম।

সেই তৈন গাঙ্গ থেকে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরেছে দেশে বিভিন্ন প্রান্তে। তিন পার্বত্য জেলা ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে তঞ্চঙ্গ্যাদের অবস্থান কক্সবাজার জেলা এবং রাঙ্গুনিয়া উপজেলায়। অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মত তঞ্চঙ্গ্যাদেরও রয়েছে নিজস্ব বর্ণমালা যা মারমা বর্ণমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং চাকমা বর্ণমালার সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। তঞ্চঙ্গ্যাদের সর্বমোট বারটি গছা রয়েছে। সেগুলো হল ১.ধন্যাগছা ২.কার্‌রআ গছা, ৩.মো অ গছা, ৪. মংলা গছা, ৫.লাং গছা, ৬.মেলং গছা, ৭.তাসসি গছা, ৮.লাপস্যা গছা, ৯.তামলুক গছা, ১০.রাঙী গছা, ১১আঙু গছা, ১২.অঙ্য গছা। সাধারণত কয়েকটি গোষ্ঠী/বংশ মিলেই গঠিত হয় একটি গছা আর সেই রকম বারটি গছা মিলেই গঠিত হয়েছে তঞ্চঙ্গ্যা জাতি। বাংলাদেশে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের বারটি গছার মধ্য সাতটি গছার মিল খুজে পাওয়া যায়। আর সেই সাতটি গছা হচ্ছে ধন্যা, কার্‌রআ, মো অ,মংলা, মেলং, লাং ও অন্য

গছা। এই সাতটি গছার মধ্য আবার ভাষাগত অনেক পার্থক্য রয়েছে যেমন সুন্দরকে "মো গছা ভাষায় বলা হয় লাভা, কার্‌রআ, গছা ভাষায় বলা হয় দোল, ধন্যা গছা ভাষায় বলা হয় ধগ আর মংলা গছা ভাষায় বলা হয় রুবইত"।

তঞ্চঙ্গ্যা নারীরা অলঙ্কারের পাশাপাশি নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরতে খুব পছন্দ করে। তাদের সেই ঐতিহ্যবাহী পোশাককে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বলা হয়ে থাকে পাইত কাপড়। পাইত কাপড় বলতে পিনন, ফাধুরি, মাদা খবং, খাদি/খারি এবং শালুম। ভাষার পাশাপাশি তঞ্চঙ্গ্যা নারীদের পরনের কাপড় গুলোর মধ্যও অনেক ভিন্নটা রয়েছে যেমন একজন ধন্যা গছা বা কার্‌রআ গছা মেয়ে পিনন তৈরি করবে তাদের সমাজের নিয়ম অনুসারে, যা দেখে সহজে বুঝা যাবে যে সেই কোন গছার মেয়ে।

অন্যান্য আদিবাসীদের মত অনেক তা এগিয়ে আছে তঞ্চঙ্গ্যা জাতি। আজ বাংলাদেশে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যারা শিক্ষা দীক্ষা, খেলাধুলা কোন দিক দিয়েই পিছিয়ে নেই। তিন পার্বত্য জেলায় তঞ্চঙ্গ্যারা চতুর্থ সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠী। বাংলাদেশ ছাড়া মায়ানমার এবং ভারতে বিভিন্ন জায়গায় তঞ্চঙ্গ্যারা বসবাস করে। যেমন মায়ানমারে মংদু, বুশিদং, সেখত্তে এবং ইয়াঙ্‌গুং সহ বিভিন্ন শহর এবং উপশহরে বসবাস করে অন্য দিকে ভারতে ত্রিপুরা, মিজোরাম, মনিপুরেও তঞ্চঙ্গ্যাদের বসবাস রয়েছে। বিচার- বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, মায়ানমার এবং ভারতের বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যারা অনেক তা পিছিয়ে আছে বাংলাদেশের তঞ্চঙ্গ্যাদের চেয়ে তা হোক শিক্ষা দীক্ষায় বা পোশাক-আসাকে। মায়ানমারে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা নারীদের নিজস্ব কোন পোশাক নেই তারা মুলত মারমা বা রাখাইনদের পোশাক পরিধান করে থাকেন, অন্য দিকে ভারতে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা নারীদের নিজস্ব পোশাক থাকলে চাকমাদের পোশাকের সাথে অনেকতাই মিল রয়েছে। তাই তারা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে নিজেদের পোশাক এবং নিজেদের ঐতিহ্য। সেখানে ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান হলেও তঞ্চঙ্গ্যা নারীরা সাধারণত চাকমা পোশাক বা ইন্ডিয়ান কালচারাল পোশাক পরে অংশগ্রহণ করে থাকেন। যা একজন তঞ্চঙ্গ্যার কাছে অনেক লজ্জার এবং অপমান জনক।

শিক্ষাদীক্ষায়, খেলাধুলায় এবং পোশাক-আসাকে মিল না থাকলেও সামাজিক নিয়মকানুন সকল তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্য অনেকতা মিল রয়েছে। যেমন সমাজে কোন ব্যক্তি মারা গেলে সেই দিন গ্রামের সকলে মিলে ঐ মৃত ব্যক্তি সংস্কার করার কাজে এগিয়ে যাওয়া। সংস্কার কাজ শেষে ঐ পরিবারকে সাহায্য স্বরূপ নিম্নতম

হলেও এক কেজি চাল এবং কিছু পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে সেই পরিবারটির হাতে তুলে দেওয়া যাতে করে সামাজিক কাজ কর্ম গুলো সহজে ছেড়ে ফেলতে পারেন। যা সমাজে একজন নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য অনেক কিছু। শুধু মাত্র তঞ্চঙ্গ্যারা নয় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যও এই প্রথা চালু রয়েছে।

বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যাদের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারা তাদের সামাজিক নিয়ম কানুন এবং ঐতিহ্য গুলো ভুলে যেতে শুরু করেছে। যেমন আগের দিনে তঞ্চঙ্গ্যা মেয়েরা বেড়ে উঠতে না উঠতেই নিজেদের পোশাক গুলোর প্রতি বেশ গুরুত্ব দিত কিন্তু বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যা মেয়েরা যত শিক্ষিত হচ্ছে তত নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলেই যাচ্ছে। তারা অনেকেই জানেই না যে কিভাবে পিনন বা খারি/খাদি বানাতে হয়। অনেক তঞ্চঙ্গ্যা মেয়ে নিজেদের পোশাক পড়তেও দ্বিধাবোধ করেন এবং তারা মনে করে থাকেন এতে তাদের অনেক মানসম্মান কমে যাবে। কারণ তারা এখন আধুনিক যুগে বাস করছে। তারা আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পছন্দ করে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য ধরে রাখা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই সবাইকে আমার বিনীত অনুরোধ আসুন সবাই মিলে আমরা আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করি। বিশ্বে দরবারে তুলে ধরি যে পৃথিবীতে তঞ্চঙ্গ্যা নামে একটি জাতি আছে যাদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, বর্ণমালা, পোশাক-আসাক এবং সামাজিক নিয়ম-কানুন। জয় হোক তঞ্চঙ্গ্যা জাতি সুন্দর হোক আমাদের ভবিষ্যৎ।

**নোটঃ** প্রাচীন ইতিহাস বলে তঞ্চঙ্গ্যা এবং চাকমার মধ্য মূল পার্থক্য হল তঞ্চঙ্গ্যারা হল "পুরাতন চাকমা" আর বর্তমানের চাকমা হল "নতুন চাকমা"।

*লেখক: ছাত্র, কাঠমান্ডু বিশ্ববিদ্যালয়, নেপাল।

# ঐতিহ্যবাহী তঞ্চঙ্গ্যা ঘিলা খেলা

## আনন্দ লাল তঞ্চঙ্গ্যা

ঘিলাখেলা মানে তঞ্চঙ্গ্যা জাতি। তঞ্চঙ্গ্যা জাতির ঐতিহ্য কেন না, ঘিলাখেলাই জাতির সংস্কৃতির একটি মূল অংশ। তাইতো ঘিলাখেলা বললেই ছোট বড়, যুবক-যুবতী এমন কি প্রবীণ তঞ্চঙ্গ্যাদের মনের মাঝেও আনন্দের মাতাল হাওয়া বয়ে যায়। এক কথায় বলতে গেলে ঘিলাখেলা তঞ্চঙ্গ্যা জাতির প্রাণ।

আসুন এবার ঘিলা কী? ঘিলা খেলা কেমন এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা জানি।

**ঘিলা ঃ** ঘিলা হচ্ছে এক প্রকার গোটা বা বীজ। এটি প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি। পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে এক প্রকার লতা জন্মে। এই লতা জঙ্গলের বড় বড় এবং লম্বা লম্বা গাছের মগডালের সাথে পেচিয়ে থাকে। মগডালে পেচানো লতার অংশে ঘিলাতাক ধরে বা জন্মে। দেখতে অনেকটা শীমের মত। শীমের খোলচের ভিতর যেমন শীমের বীজ থাকে। তেমনি ঘিলাতাকের খোলসের ভিতর ঘিলাতক থাকে। তবে শীম হচ্ছে ছোট আর ঘিলা তাক হচ্ছে অনেক বড় ও শক্ত। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, ঘিলা লতায় ফুলফুটে কিন্তু দেখা যায় না। তঞ্চঙ্গ্যাসহ অন্যান্য সকল পাহাড়ি অদিবাসীরা বিশ্বাস করেন ঘিলা তাক বা ঘিলা হল একটি পবিত্র ও অলৌকিত শক্তি সম্পন্ন বস্তু। তাই সাধারণ মানুষে এই ফুলকে দেখতে পায় না। শুধু মাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ধর মণি-ঋষি বা মহা মানবেরা এই ঘিলা ফুল দেখতে পান। এজন্য তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়রা ঘিলাকচোই পানি (ঘিলার ভিতরের সাদা অংশ আর কচোই বা কাঁচ হলুদ মিশ্রিত পানি) দিয়ে সকল অসুচি বা অপবিত্র জিনিসকে শুদ্ধ বা পবিত্র করে। যেমন- নবাগত শিশু সন্তান জন্ম নিলে, মানুষ মারা গেলে, বাড়িঘর ইত্যাদি ঘিলাকচোই পানি দিয়ে শুদ্ধ করে। তাছাড়া ঘিলাতাক বাড়ি-ঘরের দরজার সামনে টাঙ্গিয়ে রাখে। এতে ঘরে অসৎ ভূত, প্রেত দেবতা ঢুকতে না পারে এবং ঘরে বজ্রপাত পড়তে পারে না। পাশাপাশি এটি বাড়ি ঘরের সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি করে।

### ঘিলাখেলা এবং এর ইতিহাস

প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়মের সাথে তঞ্চঙ্গ্যাদের জীবন ধারা একই সুতায় গাথা। তঞ্চঙ্গ্যাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান পেশা হল জুম চাষ (পাহাড়ের

উপর কৃষি চাষ) প্রকৃতিগত ভাবে জুম চাষে শীতকাল ও ঋতু রাজ বসন্তকালে তেমন একটা কাজ থাকে না। তঞ্চঙ্গ্যারা এই অবসর সময়টা কাটান নিজস্ব খেলাধূলা খেলে ও আনন্দ বিনোদনের ম্যধ্য দিয়ে। বলা যায় স্বীয়-সংস্কৃতি চর্চায় দিন কাটে অবসর সময়ের।

অপর দিকে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট ঘিলা বা ঘিলাতাক পরিপক্ক হয় এসময়, তখন তঞ্চঙ্গ্যা কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা দল বেধে মনের আনন্দে উবাগীত (তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় দ্বৈত গান) গেয়ে গভীর জঙ্গলে যায় ঘিলা বা ঘিলাতাক খুজতে, ঘিলাতাকগুলো বাড়িতে এনে, কিছু অংশ ভেঙ্গে খোলস থেকে বের করে। সুন্দর ভাল ঘিলাগুলো বাছাই করে নেয়। এবং কিছু ঘিলাতাক বাড়িতে রেখে দেয়। এরপর শুরু হয় ঘরের উঠান পরিস্কার করা ও মাটি দিয়ে মাজা। অর্থাৎ খেলার মাঠ তৈরী করা। মাঠ তৈরী হওয়ার পর সবাই মিলেমিশে দুই দলে ভাগ হয়ে, বিভিন্ন কলাকৌশলে ও নিয়মের মাধ্যমে ঘিলা খেলা খেলে। তবে গছা (গোত্র) বা অঞ্চল ভেদে এই খেলার কলা-কৌশল ও নিয়মের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। সেই আদিকার দিনে ঘিলাখেলা খেলত অবসর সময়ে। তবে মূল আসর জমত বিষুর (বাংলা নববর্ষের) সময়। তৎকালিন সময়ে পাড়ার কারবারী (পাড়া প্রধান) অথবা হেডম্যান (মৌজা প্রধান) বা পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তির বাড়ির উঠানে যুবক যুবতী কিংবা গাবুইয়্যা মাংগোয়াং (অবিবাহিত ও বিবাহ) দুই দলে বিভক্ত হয়ে রাতব্যাপী ঘিলাখেলা খেলত। যার বাড়ির উঠানে খেলা হত, সম্মান স্বরূপ তাঁর নামে খেলাটি উৎসর্গ করা হত। আর তিনি খেলোয়ারদের পুরষ্কার স্বরূপ শুকর কেটে ভাত খাওয়াতেন অথবা সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করতেন। এই ধারাবাহিকতা যুগের পর যুগ চলতে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর প্রসার ঘটে এবং কিছু কলা কৌশল ও নিয়মের কিছুটা পরিবর্তন আসে। পাড়া থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে অঞ্চল পর্যায়ে টুর্ণামেন্ট আকারে ঘিলাখেলা শুরু হয়। ১৯৯৫ সালের পর থেকে এর বিশেষ পরিবর্তন লক্ষনীয় বিভিন্ন এলাকায় অঞ্চল পর্যায়ে ঘিলাখেলা টুর্ণামেন্ট আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন পাড়া ও গ্রাম থেকে অংশগ্রহণ করে থাকে। এভাবে কিছুকাল চলার পর ২০০৮ সনে বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা (বাতকস) এর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ঘিলাখেলা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে থাকে। তখন খেলার কলা কৌশলগুলো একটি নির্দিষ্ট নিয়মে করে এবং এর নিয়মনীতিগুলো আইন হিসেবে গণ্য করে একটি ঘিলাখেলা সংবিধান তৈরী করা হয়।

সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রাপ্ত অনুদান ও সাহায্য সহযোগিতায় বাতকস তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা টুর্ণামেন্ট কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন করে থাকেন। অতঃপর বলা যায় তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সৌভাগ্য বসত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

কর্তৃক এক লক্ষ টাকা অনুদানের মাধ্যমে ঘিলাখেলা টুর্ণামেন্ট এর জন্য একটি গোল্ডকাপ পাওয়া যায়। ২০১২ সনে সর্বপ্রথম তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয় রোয়াংছড়িতে এরপর তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্ট-২০১৩ অনুষ্ঠিত হয় রেইছা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গন, বান্দরবানে। বলা যায় এটি এতকাল সময়ের সবচেয়ে বড় জমজমাট অনুষ্ঠান। কিন্তু বড়ই দুঃখের ও আশ্চর্যের বিষয় বান্দরবানের রাজনৈতিক পরিবেশের অবস্থা দন্ড থাকার কারণে অনিশ্চিত হয়ে যায় তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্ট- ২০১৪ কেননা তখন সরকারি-বেসরকারি কোন অনুদান বা সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা তেমন ছিল না বললে চলে। তখন দুইজন যুবক উদ্দ্যেগ নিল যে, প্রতিবার বাতকস তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা টুর্ণামেন্ট আয়োজন করে এবার না হয়, তঞ্চঙ্গ্যা যুব সমাজে আয়োজন করবে। দরকার হলে এবার আমরা গোল্ডকাপটি প্রদান করব না। যেই ভাবনা, সেই কাজ। হাতে ও তেমন সময় নেই। সেখানে নূন্যতম ৩০ থেকে ৪৫ দিন সময় প্রয়োজন। সেখানে তাদের মাত্র ৭ থেকে ১০ দিন সময় আছে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তাদের সব ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে বাতকস এর নেতৃবৃন্দদের কাছ থেকে অনুমতি নিল। এরপর বিভিন্ন তঞ্চঙ্গ্যা পাড়া যুব সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় বসা হয়। সকলের সম্মতি জ্ঞাপন করলেন নিজেরদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি রক্ষায় ছোটখাট করে হলেও তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা টুর্ণামেন্ট আয়োজন করা প্রয়োজন। অতঃপর গঠন করা হল আয়োজক কমিটি। ভেন্যু নির্ধারণ করে রেইছা সিনিয়র পাড়া মাঠ প্রাঙ্গন। স্বাভাবিকভাবে অনেকের মনে প্রশ্ন এবারে আয়োজনে বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা যুব সমাজ কেন? যাই হোক মোটামুটি সকলে রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছিল অনুষ্ঠানটি সুস্থ সুন্দর ও সার্থকভাবে সফল করার জন্য। তারপরও মনে সংশয় থেকে যায়। কারণ যেখানে বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সংস্থা লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান ও বাজেট নিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে সেখানে মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাক বাজেট নিয়ে কাজ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। পরিবর্তীতে বাতকস নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে প্রদান করা হয় গোল্ডকাপটি।

অবশেষে সব বাধা পেরিয়ে সকলের সাহায্য সহযোগিতায় সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্ট ২০১৪ সফল ভাবে সম্পন্ন হয়। যা অনেকেই চিন্তা করতে পারে নাই। সিনিয়র পাড়ার মধ্যে এত সুন্দর অনুষ্ঠান করা কিভাবে সম্ভব।

সূর্যকে ঢাকা আকাশের কাল মেঘ আজ বুঝি কেটে গেছে। এমনটাই বলতে হয়। কেননা পরবর্তীতে ঘিলাখেলার সময় আসার অনেক আগে খবর আসে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্ট ২০১৫ এর স্পনসর হতে চায়। এই যেন মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। কাজেই আবার ঘিলাখেলার হাল ধরল বাতকস। তাই অনেক আগে ভাগেই শুরু হয় তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা গোল্ডকাপ টুর্ণামেন্ট ২০১৫ এর প্রস্তুতির কার্যক্রম। ভেন্যু হিসেবে আবারো নির্ধারণ করা হয় রেইছা সিনিয়র পাড়া মাঠ প্রাঙ্গণে। খুব জাকজমকভাবে অনেক বড় অনুষ্ঠান যথাসময়ে আয়োজন করা হয়। পরিণত হয় এক মহামিলন মেলার। তাইতো মিলন ঘটেছে বান্দরবানের শীর্ষ রাজনৈতিক দুই নেতার। গর্ব করে বলা যায়, বর্তমান সময়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘিলাখেলা অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়, এভাবে আর কত দিন চলবে সরকারি বেসরকরি অনুদানের উপর নির্ভর করে। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতি আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় আমাদের একটি স্থায়ী তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলাখেলা টুর্ণামেন্ট কমিটি গঠন করা প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট একটি ফান্ড থাকা অত্যাবশ্যক। যাতে ঘিলাখেলা আয়োজন করতে আমাদের খিমশিম খেতে না হয়। আর আমাদের এই ঘিলাখেলাকে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম তথাপি বাংলাদেশে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেন প্রচার ও প্রসারণ করতে সকলে মিলে সক্ষম হই। পরিশেষে আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটি কাউকে হেয় করা বা সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে নয়। তাই আমি কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করিনি। যদি কোন ভূলত্রুটি হয়ে থাকে সকলে সুন্দর ও ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন।

*লেখক: সাবেক আহ্বায়ক, তঞ্চঙ্গ্যা জাতীয় ঘিলা খেলা ২০১৪।

# স্কাইক্যাফে

রায়হান রাইন

স্কাইক্যাফে জুড়ে এখন শরৎকাল,
অপরাহ্ন বেলা যায় যায়। আমাদের
মাঝখানে ঝুলে আছে দীর্ঘ একটি পঙ্‌ক্তি
অসমাপ্ত আলাপের মতো। তখন কি
উনিশশো সাতাশি সাল, যেখানে আমরা
আরেকবার ফিরতে চেয়েছি? রাত্রিশেষ,
স্কাইরুফে নিঃসীম আকাশ অবশেষে
দুয়ার খুলেছে, আমরা জলার ধারে
মিষ্টি জলে ডুবিয়েছি নাক পাশাপাশি;
আড়চোখে দেখছি, নিজেরই মৃত্যুকে দেখে
যেভাবে ঘাতক। কালঘুম থেকে জেগে
দেখব সূর্যের মুখ, অন্তরীক্ষ নীল–
স্কাইরুফে অনেক কথার উপহার,
উনিশশো সাতাশি সাল, ডুবে যাচ্ছে মেঘে।

* শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

# প্রেমিকার প্রতি

## প্রিতম আজিম

বৃত্তের পরিধি বেড়েছে,
ফলে ব্যাসও বৃদ্ধি পেয়েছে,
বিশ্বায়নের যুগে আজকের বিশ্বে।
সবকিছুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছাকাছি মনে হয়।
তাইতো কম্পিউটার-ইন্টারনেট-ইমেইল-ফ্যাক্স
কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থান।
রতি-কাম-যৌনতা-সেক্স
ছাড়িয়ে সীমানা ঊর্ধ্বে বিধান।
তবুও আমার মনে পড়ে সেই '৪৭ এর দুর্ভিক্ষ কিংবা
'৭৬ এর মন্বন্তরের কথা।
কারণ উত্তর আধুনিকতার ছোঁয়ায়
বিশাল পরিবর্তন এসেছে কবিতায়।
'৪৭ এর দুর্ভিক্ষের শকুনীর মতো
কবিতা, কবিতার পাতাগুলো
আর অসহায় মানুষের মাংসের মতো
আমি কবি। তবু-
কবিতার পাতাগুলোর প্রতি-
প্রশান্তের প্রেম, আমাজানের ভালবাসা
যদিও পাতাগুলো নোংরা নষ্ট নারীর মতো।

*ছাত্র, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

# শান্তি চুক্তি

কৃষ্ণা তঞ্চঙ্গ্যা

১৯৯৭ সালে হয়েছিল শান্তিচুক্তি,
এখনো থামেনি সরকারের বৈষম্য নীতি,
এত বছর পরও হয়নি চুক্তির বাস্তবায়ন ।
কখন হবে শান্তির আগমন?

এত সংখ্যক আর্মি ক্যাম্প, পুলিশ ফাঁড়ি
রাজপথ রক্তে প্লাবিত ।
ধর্ষনের শিকার আদিবাসী নারী,
কল্পনা, সবিতা, থোমাচিং নেই আজ জীবিত
গ্রামের ভাংচুর হামলা
নিশ্চুপ এখানকার সরকারি আমলা ।
সেনা, সেটেলারদের কর্তৃক গ্রাম উচ্ছেদ
বেড়েছে জ্বালা যন্ত্রনা মানুষের উদ্বেগ ।

নিষ্পত্তি হয়নি ভূমি কমিশন ।
সাথে আরো সেটেলার মাইগ্রেশন ।
এখানে নেই কোন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম ।
সরকারের মনোভাব ব্যতিক্রম!!!

*ছাত্রী, ঢাকা মহিলা কলেজ ।

# এখন

## জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা

এখন সবুজ পাহাড়ের পেটে সভ্যতার
কুৎসিত হিংস্র ভ্রূণ
ষড়যন্ত্র আর আধিপত্য বাদের।
এখন সবুজ পাহাড়ের হৃদপিন্ড
চেরে আগ্রাসী অন্ধকার,
বিপন্ন জনপদ, সবুজ পাহাড়।
এখন পাহাড় রাণীর চোখে
পাথর-ভাঙা ঝরনার তরঙ্গাশ্রু
চেঙ্গী, মাইনী, কাচলং, শঙ্খ নদী টলোমল।

এখন পাহাড়ে দিন আসে নীল আকাশে
বিষাক্ত বাতাসে কুন্ডলী
খেলে উগ্র সাম্প্রদায়িকতায়।
এখন তোমরা কেড়ে নিচ্ছ জাতির
স্বপ্নময় অনেক সময়।
উন্মাদ আক্রোশে হয়েছো কাপুরুষ
এখন ও অতৃপ্ত ঘাতকরা উলঙ্গ উল্লাসে
ছুটে আসছে খুনের নেশায়।

এখন তোমরা পথ হারিয়েছ পথে
অবিরাম বিপর্যয়ে কাল;
সামনে যমদূত, ভেসে যাবে সব
অপ্রতিরোধ প্লাবনে।

*সভাপতি, ইন্ডিজেনাস্ স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন, জা. বি.।

# আমি দেখেছি

## অনিক তঞ্চঙ্গ্যা

আমি দেখেছি রাষ্ট্রের শোষণ
নিপীড়ন আর রাষ্ট্রের আগ্রাসন
আমি দেখেছি সেনাবাহিনীর নির্যাতন
গণহত্যা আর কল্পনা অপহরণ ।

আমি দেখেছি লোগাং, সাজেক বাঘাইছড়ি,
পোড়া মন্দির মূর্তি আর পোড়া ঘরবাড়ি ।
আমি দেখেছি সেটেলারদের হামলা,
ভূমি দখল আর লুন্ঠন,
আমি দেখেছি নরপশুদের বর্বরতার
জয়োচ্ছ্বাস আর নিরব প্রশাসন ।

আমি শুনেছি জুম্ম নারীদের কান্না
বাঁচার আকুতি আর আর্তচিৎকার,
আমি শুনেছি এই বর্বরতার
হয়না কখনো কোন বিচার ।

তবুও আমি স্বপ্ন দেখি নতুন
করে বাঁচার,
একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই আমার
আত্মপরিচয়ের অধিকার ।

*সভাপতি, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার ফোরাম ।

# জুম্ম নারী

রুপনা তঞ্চঙ্গ্যা

হে জুম্ম নারী তোমরা আর কত থাকবে অন্ধকারে?
আর কত থাকবে নীরবে?
থেকনা অন্ধকারে,
নেমে এসো আলোর পথে,
জাগো জুম্ম নারী জাগো
অন্যায়কে প্রত্যাহার করে
প্রতিবাদ করতে শেখো।

আর কত সহ্য করবে নির্যাতন আর অত্যাচার
এবার আমরা চাইবো আমাদের অধিকার
আর নয় গুটিয়ে হাত
করো এবার প্রতিবাদ
জাগো জুম্ম নারী জাগো
শোষণ কারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে
শাসন শোসকের বিরুদ্ধে চোখ রাধিয়ে,
আঙ্গুল তুলে প্রতিবাদ করতে জানি।

জাগো হে জুম্ম নারী জাগো,
হে জুম্ম প্রতিবাদি নারী জেগে উঠো
বসে থেকোনা আর ঘরের কোণে
এসো যোগ দাও আন্দোলনে, সামিল হও সংগ্রামে
বিজয় মুকুট পরে বসে যাও সে সিংহাসনে,
জাগো হে জুম্ম নারী জাগো!!

*ছাত্রী, বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

# জেগে উঠুন সংগ্রামী জুম্ম সমাজ

**সাধন তঞ্চঙ্গ্যা**

আর কতকাল শোষিত হব
আর কতকাল পিছিয়ে থাকব
জেগে উঠো, উঠো জেগে
আমাদের প্রাণপ্রিয় জুম্ম সমাজ
আর নয় পিছিয়ে থাকা,
সময় এখন আলোর দেখা
অধিকার আদায়ে আমরাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এগিয়ে যাবো হাতে হাত রেখে
আর নয় নিজ স্বার্থে,
ভাবো জুম্ম সমাজ তোমার
প্রাণপ্রিয় জাতির স্বার্থে
ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিই
হারাবো আর কত,
হারিয়েছি কিবা কত।

এক হও-হও এক
হারাতে দেব না আর কিছু
নামবো না সংগ্রামী শুদ্ধ সমাজ
অন্যের ভয়ে আর পিছু
সময় এখন এগিয়ে যাবার,
নতুন আলোর খোঁজে
যে আলোয় আলোকিত হবে
আমাদের সমগ্র জুম্ম সমাজ।

হাতে হাত কাধে কাধ
মনে রেখে বল,
পরাধীনতার গ্লানি মুছে
আলোর সন্ধানে চল
তাই হবে আজ আমাদের শ্লোগান
জেগে উঠুন হে সংগ্রামী জুম্ম সমাজ।

*ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

# আমি আদিবাসী

নিক্সন তঞ্চঙ্গ্যা

কোন এক পড়ন্ত বিকেলে, গোধূলী সন্ধ্যায়,
একাকী নীরবতায় বসে
দূরের কোন অজানা দৃশ্য দেখে,
তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে,
নিজের অজান্তে প্রশ্ন জাগে!
আমি কে?

কী আমার পরিচয়?
যে দেশে জন্ম আমার,
সে দেশ বলে কিনা, তুমি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী!
এ কেমন অপবাদ?
নিজ দেশে পরবাসী।

আদি থেকে অনন্তকাল সবাই জানে,
আমি-ই আদিবাসী।
যে দেশ আমার পূর্ব পুরুষদের সংস্কৃতিতে ভরা
সে দেশ, তার প্রমাণ চাই?
মধুর মত মায়ের ভাষা, চোখ ধাধানো পোশাক, ঐতিহ্য ভরা সংস্কৃতি,
এই আমার চিরন্তন সত্য প্রমাণ, আমি যে আদিবাসী।

*ছাত্র, বি.এস.এস, কবি নজরুল সরকারি কলেজ।

# অবহেলা

প্রমিলা তঞ্চঙ্গ্যা

নিজের প্রতি নিজের,
পরের প্রতি পরের।
আমার প্রতি তোমার,
তোমার প্রতি আমার।
আমাদের প্রতি তাদের,
তাদের প্রতি আমাদের।
এই কেমন অবহেলা...?

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার,
নারীর প্রতি পুরুষের,
পুরুষের প্রতি পুরুষত্বের।
নিম্নের প্রতি উর্দ্ধের,
উর্দ্ধের প্রতি সর্বোচ্চর,
দূর্বলের প্রতি সবলের,
সবলের প্রতি ক্ষমতাসীনের।

ভালবাসার প্রতি সম্পর্কের,
জীবনের প্রতি মানুষের।
প্রকৃতির প্রতি প্রাকৃতির,
কৃত্রিমের প্রতি কৃত্রিমত্বার।
সমাজের প্রতি জাতির,
জাতির প্রতি রাষ্ট্রের।

উন্নয়নের প্রতি চুক্তির,
চুক্তির প্রতি বাস্তবায়নের।
জনগনের প্রতি সরকারের,
রাষ্ট্রের প্রতি জনগনেরর।
কতই না অবহেলা।

*ছাত্রী, চট্টগ্রাম কলেজ।

## “তৈন্‌গাঙ”

শুকতারা তঞ্চঙ্গ্যা (চুমকী)

তৈন্‌গাঙ লিখছি তোমাকে নিয়ে
তুমি কতনা আমার আপন
সেই পাহাড় অরণ্য বুক ছিড়ে
বয়ে চলেছ অনন্তকাল ধরে।
তোমায় নিয়ে লেখা হচ্ছে
শত শত গান, কবিতা, গল্প।

তৈন্‌গাঙ লিখছি তোমাকে নিয়ে
তোমার সাথে আমার পরিচয়
সেই শৈশব কাল থেকে
তোমার নির্ঝরে গিয়েছি কতবার
পানির তৃষ্ণা মেটাতে
খুঁজেছি কত রকমের মাছ, শামুক, কাঁকড়া
আমি আজও ভুলিনি তোমাকে তৈন্‌গাঙ।

তৈন্‌গাঙ লিখছি তোমাকে নিয়ে
আমি এখনও অনুভব করি সেই
পড়ন্ত বিকেলে কলসি হাতে
পানি আনতে যাওয়া।
দেখেছি তোমার কচিকাচা ছেলেমেয়েদের
কানামাছি লুকোচুরি খেলা করা।

আর বিধুর মনোরম রশ্মিতে সবাই মিলে
তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী ঘিলা খেলা করা,
জুম ঘরের উঠানে বসে
দাদুর বেহালার সুরে শুনতাম
তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী গেঙ্গুলির গান,
রাধামন-ধনপতির প্রেমের কাহিনী।

*ছাত্রী, বান্দরবান সরকারি কলেজ।

# জুম পহ্

স্মরণ বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা

ছয় উচানি মোইনহ্ লেচাত
আমা ঘহ্ কাই,
পুত্তি বিন্যা জাগেরে-তে
দিন্নয়া পহ্ পুরিনান।
চায়হ্ হ্যাত্যি রঙে ডঙে পহ্

ডাগরন্দে বানা পাছ্যরহ্,
পুছ্যন্দে বুউত ফুল...
সনাহ্ সনাহ্ বাইত নিগেত্বে
নয়া জুমত্ ফুলানিত্তুন।
জুমহ্ মারাই মারাই বহ্ বাত্বেহ্
নাচরন্দে ধান ফুলহ্ পুক্কানি,
সারাল্যা চিলয়া পিক পিক গুই ডুগিনান
.ভার মাস্যা দিন্নয়া পুইবছি।

ধান কাবি-বাক জুমহ্ মানুষ্যানি
জমে থুবাক টেইক আ সং বুইনান,
বছহ্ মেষত নয়া ভাত হেবাক পুইবছি নয়া সগহ্ দিনানি।

*ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ৪র্থ বর্ষ, বান্দরবান সরকারি কলেজ।

## জুমের আলো (বাংলা অনুবাদ)

ছড়ার উজানে পাহাড় ঘেঁষে
মোদের বাড়ির পাশে
ভোর সকালে জেগে উঠে,
দিন প্রহরের আলো
চারিদিকে সৌন্দর্যের মায়াবী হাতছানি ।

পাখির কল মধুর স্বরধ্বনি
ফুটেছে নানান ফুল
সুগন্ধ বেড়োয়
নতুন জুমের ফুল হতে ।
জুমের উপর বাতাস বহে
নাচে ধানের ভোমরা
চিল পাখি আওয়াজ তোলে
ভাদ্র মাস আসবে বলে ।

জুম চাষিরা ধান কাটবে
ভরবে গোলায় ধান
বছর ঘুরে নবান্ন উৎসব ।
নতুন দিনের নতুন হাসি
গাইবে সুখের গান ।

# পিঁইড়া (ছড়া)

ধনা তঞ্চঙ্গ্যা

বুলি পিঁইড়াবা পেদ দুলাইনে
গাআত্তে সা-রে-গা-মা
মনে মনে কত্তেতে একখান গান শুনি যনা।
হর পিঁইড়ার হরহরানি গাইছে আর বাইছে
বাহাবানি পাদাত মচা সুয়ে থান আঁউসে।
হুইদ পিঁইড়া গুরি-গুরি
অক্কে অক্কে ন'দেহন রিভি চোয়েনদি বুড়াবুড়ি
আঁউইন পিঁইড়ার রাঙা লাম্বা লাইন
হামাইল্লে জ্বালাপড়া কুদি ঠাইন কুদি যাইন।

*সাবেক ছাত্র, বাংলা বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

## সাত গছা তঞ্চঙ্গ্যার উদ্দেশ্যে তঞ্চঙ্গ্যা উবাগীত

ভূষন তঞ্চঙ্গ্যা (দাদুভাই)

রোঔন লাগাই এ গছা,
মিলি থাবং সাত গছা,
উলু পারি পেকানত
সমারে থাবং একান্নত
দিলং ভাত জোরা গঙ্গারে
জিনেদি থাবং সমারে
যর্দে রানি সরানদে
সাত গছা যদিমিলি থাগি
স্বর্গ যমরাজা পর্যন্ত দরাইদে
জাদি পাক্কালুং জোনপোয়াসাদ
জাল্ল্যাই মাইত দুউততন বড় দুখ্যাদ
বেবে ধন পদি ইসার মাদাদ
টেংটানিনাই বোয় আহে গাল পুল্যা
জিরোনী মুবা কাপ দুস্যা
মইন মুরাউন হোয়া পুম্যা।

*শিল্পী ও কবি।

# তঞ্চঙ্গ্যা গীত

## "গম্লাগেত"

### অমিত তঞ্চঙ্গ্যা

গম্লাগেত্ মনানত্ আইতচিআ ই-দিনত্;
জা-র মানোইত্ থুবায়ি ব্যাগ্কুন্ এগ্কানত্।
আগন্ আইত্চিআ সংসমাইস্যা, আগন্ দাঙলগ্।
কৈ ন-যানং এরগ্ যে, গম্লাগেত্ মনত্।
নাচিবং গীত্ গাইবং আইত্চিআ ই-দিনত্;
সু-গ দু-গ করানি কোবং ভাঙি ই-দিনত্।
আইস আইস সংসমাইস্যা, আইস ব্যাগ্কুনে;
আশিমারি রঙে ধঙে থাবং ব্যাগ্কুনে।
উসাইবং মুসঙে ন-থাবং পিচে;
জা-র মানোইত্ অওয়ি আইত্চিআ ব্যাগ্কুন্ এগ্লগে।
আইস আইস সংসমাইস্যা, আইস ব্যাগ্কুনে;
জা-র পাগি গম্কামত্ উসাইবং মুসঙে।

# তঞ্চঙ্গ্যা গান (বঙ্গানুবাদ)

## ভালো লাগছে

আজ এই দিনে ভালোলাগছে;
জাতির মানুষ সবাই এক জায়গায় একত্রিত হয়েছি।
আজ আছে সমবয়সী (বন্ধু-বান্ধবি), আছেন বড়জন;
বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা এত ভালো লাগছে।
নাচব গাইব আজ এই দিনে;
সুখ-দূঃখে কথা শেয়ার করব আজ এই দিনে।
এসো এসো সমবয়সী (বন্ধু-বান্ধবি), এসো সবাই;
হেশে খেলে রঙে ধঙে থাকব সবাই।
সামনে এগিয়ে যাব থাকব না পিছনে;
আজ জাতির মানুষ সবাই একত্রিত হয়েছি।
এসো এসো সমবয়সী (বন্ধু-বান্ধবি), এসো সবাই;
জাতির ভালো কাজের জন্য সবাই এগিয়ে যাব।

* তঞ্চঙ্গ্যা গীতিকার ও সুরকার।